মানব সভ্যতার ইতিহাস

প্রথম পর্ব : প্রাচীন যুগ

জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ৫-১২-৭৯ তারিখের T. B. No. VI/H/79/138
বিজ্ঞপ্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার নূতন পাঠক্রমে "ষষ্ঠ শ্রেণীর" ইতিহাস
পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অনুমোদিত।

মানব সভ্যতার ইতিহাস

[প্রথম পর্ব ঃ প্রাচীন যুগ]

(ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
ইতিহাসের অধ্যাপক এবং রীডার
স্নাতকোত্তর শিক্ষা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাপ্তিস্থান

শিক্ষা প্রকাশনীর পক্ষে ৩৪৫, গাঙ্গুলিবাগান গভঃ কলোনী, নাকতলা,
কলি-৪৭ থেকে শ্রী আই. এন. ব্যানার্জী কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ : ১২ই জুন, ১৯৭৯
দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮০
তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮১
চতুর্থ সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮৪

প্রাপ্তিস্থান :
ষ্টুডেন্টস হোম
৯এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
উষা পাবলিশিং হাউস
১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
জে. এন. ঘোষ এণ্ড সন্স
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

॥ মূল্য : ... পয়সা ॥

॥ মুদ্রাকর ॥
শ্রীনিমাই কুমার ঘোষ
দি ভোলানাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৬

গ্রন্থকারের বক্তব্য

এই বক্তব্যটি মূলতঃ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি

মানব সভ্যতার উৎস এবং চালিকাশক্তি হল সংঘবদ্ধ মানুষের উৎপাদনশীল শ্রম। উৎপাদনের হাতিয়ার ও পদ্ধতি এবং উৎপাদন ধারা অনুসারে সমাজের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্কে ক্রমবিবর্তনের ধারাতেই সভ্যতার বিবর্তন এবং বিকাশ হয়েছে—এই কথাকেই নূতন পাঠক্রমের মর্মকথা বলে আমি বুঝেছি।

দ্বিতীয় কথাটি বুঝেছি যে কোন দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিছু হেরফের থাকলেও বিভিন্ন অঞ্চলের সভ্যতায় যোগা-যোগ এবং সাদৃশ্যও ছিল।

এই কথা দুটি ছেলেমেয়েদের বোঝানো উচিত বলে মনে করেছি এবং সে ভাবেই বিষয়বস্তুর অবতারণা এবং বিশ্লেষণ করেছি।

বইখানিতে 'বিষয়বস্তু' নির্ধারিত পৃষ্ঠাসংখ্যার মধ্যেই আছে। কিন্তু ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই সুবিধা হবে মনে করে অনুশীলনী অনেক বেশী দিয়েছি। পৃষ্ঠাসংখ্যা সে জন্যই কয়েকখানি বেড়েছে।

এক একটি অংশ পড়ানো হলে যেসব বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের অভ্যস্ত করানো দরকার, সেগুলিই রেখেছি 'অনুশীলনী' অংশে। প্রাথমিক পুনরালোচনার জন্য দেওয়া হয়েছে 'অভীক্ষণ' অংশ। আত্মশিক্ষা ও আত্ম-সমীক্ষা অংশের প্রশ্নপত্র অনুসারে ছেলেমেয়েদের বারে বারে পরীক্ষা নিলে সমস্ত বিষয়টিই তাদের আয়ত্তে আসবে।

বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় গল্পের ভঙ্গি রাখবারও চেষ্টা করেছি।

১২ই জুন, ১৯৭৯ **জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম—ইতিহাস কাকে বলে ঃ ইতিহাস কেন পড়বো [প্রাচীন মানুষ ও সভ্যতার কথা জানবার উপায়—২]		১
দ্বিতীয়—আদিম মানুষ		৭
তৃতীয়—পাথরের যুগ [পুরানো পাথরের যুগ—১২ ; মধ্য পাথরের যুগ—১৪ ; নূতন পাথরের যুগ—১৫]		১২
চতুর্থ—ধাতুযুগের সূচনা ঃ তামা, ব্রোঞ্জ		২৫
পঞ্চম—প্রাচীনকালে নদী-উপত্যকার সভ্যতা [(ক) মেসোপটামিয়া—৩১ ; (খ) মিসর—৩৮ ; (গ) সিন্ধু উপত্যকা—৫০ ; (ঘ) হোয়াংহো-ইয়াংসিকিয়াং—৫৮]		৩১
ষষ্ঠ—তামা-ব্রোঞ্জ যুগের শেষ ঃ লোহা যুগের সূচনা [নদী-উপত্যকা সভ্যতাগুলিতে পরস্পরের সাদৃশ্য—৬৩]		৬৩
সপ্তম—লোহা যুগের সূচনায় মানব সভ্যতা [ব্যাবিলন—৭০ ; মিসর—৭৮ ; পারস্য—৮৩ ; প্যালেস্টাইন—৮৯ ; গ্রীস—৯৩ ; রোম—১০৯ ; চীন—১২১ ; ভারত—১২৫]		৭০

মানব সভ্যতার ইতিহাস

(প্রথম পর্ব=প্রাচীন যুগ)

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস কাকে বলে=ইতিহাস কেন পড়বো

স্কুলের প্রগতিপত্রে পরীক্ষার ফল ধারাবাহিক ভাবে লেখা হয় কেন ? উন্নতি কিম্বা অবনতির বিবরণ থেকেই বোঝা যায় কি করলে আরো উন্নতি হবে। এই ধারাবাহিক বিবরণই লেখাপড়ার ইতিহাস।

ছুটির দিনে বাবার কাছে তাঁর ছেলেবেলার গল্প শুনতে ভাল লাগে। বাবাও শুনেছেন ঠাকুর্দার ছেলেবেলার কথা। এই সব গল্প থেকেই একটা পরিবারের কাহিনী জানা যায়। ঠাকুর্দার বাবা, ঠাকুর্দা এবং বাবাও বলেন, "আমাদের সময়ে এইরকম হত।" এইভাবেই পাই পরিবারের ইতিহাস।

গ্রামে বেড়াতে গেলে গাঁওবুড়ো বলেন, "বাবার কাছে শুনেছি এখানে বাঘ থাকত, দশ মাইলের মধ্যে হাট বাজার ছিলনা, কোন গাড়ী ঘোড়া ছিলনা। আর আজ এখানে রাস্তা-ঘাট, স্কুল, নলকূপ, বাজার হয়েছে, বিদ্যুতের আলো জ্বলছে। রেডিও আছে অনেক বাড়ীতেই।" এইভাবেই জানতে পারি গ্রামের ইতিহাস।

এই কথাগুলি একটা গ্রামের মত একটা দেশের পক্ষেও সত্য। আমাদের দেশে এক'শ বছর আগে এরোপ্লেনের কথা, দেড়'শ বছর আগে রেলগাড়ীর কথা ভাবাই যেত না।

সারা পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের বেলায়ই একথা সত্য। রেডিও, টেলিভিশিন কিন্তু চিরকাল ছিলনা ! মানুষ একদিন ন্যাংটা থেকেছে, কাঁচা মাংস খেয়েছে, গুহায় বাস করেছে। আর আজ মানুষ চাঁদে যাচ্ছে। কি করে এমন উন্নতি হল ? সেই কথা নিয়েই মানব সভ্যতার ইতিহাস।

হাজার হাজার বছর ধরে নানা দেশের অসংখ্য মানুষের পরিশ্রমে

অসভ্য অবস্থা থেকে আমরা সভ্য হয়েছি, এবং আরও উন্নতির চেষ্টা আজও করছি। মানুষ ভুলও করেছে, অন্যায়ও করেছে। আবার ভালও করেছে। সব কিছুকে জয় করে মানুষ এগিয়েছে। **সভ্যতার এই মিছিলে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের যা কিছু কাজ, তার বিবরণই ইতিহাস।** ইতিহাস পড়েই জানা যায় মানুষ কিভাবে বড় হয়েছে, সভ্য এবং উন্নত হয়েছে। এই কথাগুলি জানতে পারলে মানুষের কল্যাণের জন্য **আরও সুন্দর জীবন গড়া সম্ভব। এজন্যই ইতিহাস পড়া দরকার।**

প্রাচীন মানুষের ও সভ্যতার কথা জানবার উপায়

হাজার হাজার বছর আগে মানুষ কি রকম ছিল, কি ভাবে সভ্য হয়েছে, একথা কি করে জানা যায়? সেই সময়কার মানুষই নিজেদের অনেক খবর রেখে গেছে। সেগুলি উদ্ধার করেছেন এই যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকরা।

চড়ুইভাতি করতে গিয়ে মাটিতে খোঁড়া উনুন, চারপাশে ছড়ানো শালপাতা এবং হাড় দেখলে আমরা বুঝি ওখানে একদল লোক আগেই চড়ুইভাতি করেছে এবং তারা মাংসও খেয়েছে। তেমনি কোন পর্বত গুহায় কয়েক হাজার বছরের পুরানো মানুষের মাথার খুলি, পশুর হাড়, এবং ছাই পাওয়া গেলে বোঝা যায় ওখানে এমন মানুষ ছিল যারা আগুন জ্বালাতে পারত, মাংসও খেত।

রাস্তার পাশে খোলা জানালার ধারে একখানা বই রাখলে কয়েক-দিনের মধ্যেই পুরু ধুলো জমে যাবে। শত শত বছর পরে শুধু ধুলোর স্তূপই দেখা যাবে। ধুলো সরালে বই বেরিয়ে আসবে। তেমনি কোন শহরে লোকের আনাগোনা না থাকলে হাজার বছর পরে সেখানে পাওয়া যাবে বিরাট একটা মাটির ঢিবি। খুঁড়লে বেরিয়ে পড়বে শহরটি। হাজার বছর গ্রামের বাড়ীতে না থাকলে জঙ্গলের মধ্যে ঢাকা পড়বে বাড়ীঘর। সেই জঙ্গল পরিষ্কার করা হলে পাওয়া যাবে বাড়ীঘরের চিহ্ন।

১৯৭৮ সনে পশ্চিমবঙ্গে ভীষণ বন্যা হয়ে গেল! কোন কোন জায়গায় দশ বারো ফুট বালির নীচে চাপা পড়েছিল মানুষের ঘর, হাঁড়িকলসি, লাঙ্গল কাস্তে, হয়তো দু'একটা হাঁস, মুরগি, কুকুর, গরু। যদি হাজার বছর পরে কেউ বালি সরাতো, তবে সেও বুঝতে পারত এখানে ছিল একদল সুসভ্য কৃষিজীবী মানুষ।

মাটির নীচে, জঙ্গলের মধ্যে, এমনকি সমুদ্রের তলেও এইভাবে পুরানো দিনের অনেক চিহ্ন পাওয়া গেছে। কখনো হঠাৎ, কখনো পরিকল্পনা মত আবিষ্কার করে। এই ধরনের আবিষ্কার যাঁরা করেন এবং আবিষ্কৃত জিনিসের ব্যাখা করেন, তাঁদের বলা হয় প্রত্নতাত্ত্বিক। তাঁদের এই বিদ্যাকে বলে প্রত্নতত্ত্ব। এখন আমরা কাগজে লিখি, ছাপাই, আলমারিতে বই রাখি। কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে তো এই সব ব্যবস্থা ছিলনা! সে সময়ের কথা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকেই জানতে হয়।

মাটির নীচে জিনিস পেলেই হলনা! অনেক কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিতে হয়। পাথরে কিম্বা মাটির ফলকে খোদাই করা লেখা বিচার করে ভাষা-বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন কখন কোথায় ঐ ধরনের লেখা প্রচলিত ছিল। পাথর কিম্বা মাটির স্তর বিশ্লেষণ করে ভূতত্ত্ববিদরা বলতে পারেন কোন স্তরে পাওয়া জিনিস কত পুরানো। খুলি, চোয়াল আর কংকাল দেখে নৃতত্ত্ববিদরা বলতে পারেন সেই মানুষ কোন জাতির। সামুদ্রিক প্রাণীর কংকাল কিম্বা গাছের জীবাশ্ম থেকে বিজ্ঞানীরা সেই প্রাণী এবং গাছের জীবনকালের আবহাওয়ার কথা বলতে পারেন। শিল্প বিশেষজ্ঞরা শিল্পের বয়স ঠিক করতে পারেন। নানাধরনের জিনিস থেকেই মানুষের জীবনযাত্রা, ঐশ্বর্য কিম্বা দারিদ্র এবং সভ্যতার রূপ কল্পনা করা যায়।

সর্বোপরি বিজ্ঞানীরা "কার্বন ১৪" নামের এক রকম জিনিস দিয়ে পরীক্ষা করে প্রায় সব জিনিসেরই বয়স ধরে দিতে পারেন।

এইভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়ার পরে ঐতিহাসিকরা ইতিহাস লিখতে পারেন। সেই ইতিহাস

পড়ে এবং জাদুঘরে সেইসব জিনিসের নমুনা চোখে দেখে অতি প্রাচীনকালের কথাও জানা যায়।

ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকেই হাজার হাজার বছরের মানব সভ্যতার প্রাচীন কালের কথা আমরা জানবো।

ইতিহাস জানবার অন্যান্য উপায়

মাটির উপরেও রয়েছে **পুরানো মন্দির কিম্বা সৌধ** (যেমন মিসরের পিরামিড), স্তম্ভ (যেমন, সম্রাট অশোকের স্তম্ভ)। বহু পুরানো প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ (যেমন, পারসিক সম্রাটদের প্রাসাদ)। স্থপতিরা (অর্থাৎ যাঁরা বাড়ীঘর তৈরির বিশেষজ্ঞ) এ সবের বিশ্লেষণ করতে পারেন।

পাথরে খোদাই করা পুরানো লেখা থেকেও অনেক কিছুই জানা যায়। মাটির ফলকে, গাছের পাতায় এবং বাকলে খুব **পুরানো লেখাও** অনেক পাওয়া গেছে। **সীলমোহরে** আছে লেখার ও মূর্তির ছাপ। নানারকম **মুদ্রা** থেকে জানা যায় কোথায় কিভাবে বাণিজ্য হত। দেশের আর্থিক অবস্থা এবং সম্পদ কি রকম ছিল। **গয়নাগাঁটি, পোশাক, চিত্র এবং মূর্তি** থেকেও লোকের জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝা যায়। মিসরে, ব্যাবিলনে, পারস্যে, ভারতে অনেক মূর্তি এবং ভাস্কর্যের অন্যান্য জিনিস পাওয়া গেছে।

তা ছাড়া গ্রীক কবি হোমারের কাব্যই বলি, ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের বিবরণই বলি, আমাদের বেদ, উপনিষদ, গীতা রামায়ণ-মহাভারতের কথাই বলি—এইসবে আছে অনেক কথা। এইসব **লিখিত অথবা সাহিত্যিক প্রমাণ** থেকেও অনেক কিছু জানা যায়। এমন কি অনেক সময় **লোক কাহিনী** থেকেও সত্য ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

যেখানে যত রকম প্রমাণ পাওয়া সম্ভব, সবগুলি সংগ্রহ করে, নিজে নিঃসন্দেহ হয়েই ঐতিহাসিক ইতিহাস লেখেন।

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে :—

১। অতীতের সাথে তুলনা করেই উন্নতি অবনতি বুঝতে পারি।

২। অতীতকাল থেকে আমাদের সভ্যতার ক্রমাগত উন্নতির কথাই জানা যায় ইতিহাস থেকে।

৩। নিজেদের জীবনযাত্রা উন্নত করবার জন্যই ইতিহাস পড়া দরকার।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :

(ক) স্কুলের ধারাবাহিক প্রগতিপত্রে তোমার কি উপকার হয়? (খ) তোমাদের মত ছোট ছেলে/মেয়ে নিজের পরিবারের ইতিহাস খুব সোজা ভাবে কি করে জানতে পার? (গ) একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা গ্রামের কতটা উন্নতি হয়েছে, সে কথা কি করে বুঝা যায়? (ঘ) ইতিহাস পড়লে কি উন্নতি হয়? (ঙ) পর্বতের গুহায় হাজার হাজার বছরের পুরানো মানুষের কংকাল এবং ছাই পাওয়া গেলে আমরা কি সিদ্ধান্ত করতে পারি? (চ) খোলা মাঠে একখানা বাড়ী বছরের পর বছর পড়ে থাকলে কি অবস্থা হবে? (ছ) কার্বন ১৪ দিয়ে ইতিহাসের কি কাজ হয়? (জ) ইতিহাস রচনায় শিলা লিপি, বাড়ীঘর, মন্দির, শিল্প সাহিত্যের কি দাম আছে?

করবার মত কাজ

১। ঐতিহাসিককে যে সব বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে হয়, তাঁদের একটা তালিকা বানাবে।

২। যে সব জিনিস এবং অন্যান্য প্রমাণ থেকে ইতিহাস রচনা করা হয়, তার একটা তালিকা তৈরি করবে।

আত্মশিক্ষা ও আত্মসমীক্ষা

তুমি প্রাচীনকালের মানুষের সভ্যতার কথা পড়ছ। কতটা বুঝেছ পরীক্ষা করবার জন্য প্রশ্ন দেওয়া হল।

প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষেই একখানি প্রশ্নপত্র পাবে। অধ্যায়টি শেখা হলে সেই অধ্যায়ের প্রশ্নপত্র অনুসারে পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষার মধ্যে বই দেখবে না।

উত্তর লেখা শেষ হলে নিজেই বইয়ের সাথে মেলাবে। এবং নম্বরও দেবে। যেখানে কয়েক লাইন লিখতে হয়েছে, সেই সব প্রশ্ন দিদিমণি—মাষ্টারমশাইকে দেখিয়ে তাঁদের থেকে নম্বর নেবে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পরীক্ষা শেষ করবে। শতকরা ৫০ নম্বরের কম পেলে পাস নয়। বারে বারে নিজেকে পরীক্ষা কর।

প্রথম অধ্যায় থেকে পরীক্ষা

মোট নম্বর –১০০ ; সময় ২ ঘণ্টা

১। **খুব সংক্ষেপে উত্তর দাও :—** ২ × ৯ = ১৮

(ক) খুব সহজভাবে কি করে নিজের পরিবারের ইতিহাস জানা যেতে পারে? (খ) প্রত্নতত্ত্ব কাকে বলে? (গ) স্থপতি কাদের বলে? (ঘ) শিলা লিপি জিনিসটি কি? (ঙ) ইতিহাস পড়লে কি লাভ হয়? (চ) বহু পুরানো দিনের কথা কিভাবে জানা যেতে পারে? (ছ) ভূতত্ত্বের সাথে ইতিহাসের কী সম্পর্ক? (জ) ইতিহাসের সাথে ভূগোলের কী সম্বন্ধ? (ঝ) গয়নাগাঁটি থেকে পুরানো দিনের কথা কিভাবে বোঝা যায়?

২। প্রতিটির উত্তর মাত্র পাঁচ লাইনে লেখ :— ৪ × ৮ = ৩২

(ক) কার্বন ১৪ দিয়ে ঐতিহাসিকের কি কাজ হয়? (খ) স্কুলের প্রগতিপত্রে ছাত্রদের কি উপকার হয়? (গ) ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য অতীতের ভালমন্দের কথা জানতে হবে কেন? (ঘ) বছরের পর বছর গ্রামে শহরে উন্নতির পরিমাপ কি ভাবে করা যায়? (ঙ) দেশের ইতিহাস বলতে কি বুঝায়? (চ) মুদ্রা থেকে ইতিহাসের কথা কি ভাবে জানা যায়? (ছ) মানব জাতির ইতিহাস বলতে কি বুঝায়? (জ) নৃতত্ত্বের সাথে ইতিহাসের সম্বন্ধ কী?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ :— ৮ × ৫ = ৪০

(ক) ইতিহাস কাকে বলে? (খ) ইতিহাস পড়লে কি উপকার হয়? (গ) কোন্ কোন্ জিনিসের সাহায্যে ইতিহাস রচনা করা যায়? (ঘ) ঐতিহাসিককে কোন কোন বিদ্যায় পারদর্শীদের মতামত নিতে হয়? (ঙ) পুরানো জিনিসপত্রের বয়স কি ভাবে ঠিক করা সম্ভব?

৪। যে সব প্রমাণ থেকে মানব সভ্যতার খুব পুরানো দিনের ইতিহাস রচনা করা যায় তার একটি তালিকা দাও। ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিম মানুষ

বিজ্ঞানীরা বলেন আমাদের পৃথিবীটার বয়স নাকি কোটি কোটি বছর। সেই সময় ধরে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর আবহাওয়া, আকার এবং গড়নে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে গাছপালা এবং জীবন্ত প্রাণী। নানা ধরনের নিম্নস্তরের প্রাণীর পরে সৃষ্টি হয়েছে গেছো বাঁদর এবং সব শেষে মানুষ।

মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল। হাত, পা, আঙ্গুল নাড়াতে পারল। হাতের মুঠোয় জিনিস ধরতে পারল। দু'পায়ে হেঁটে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পারল। তার মস্তিষ্কের উন্নতি হল।

নীচু স্তরের প্রাণী থেকে মানুষ

কথা বলতে পারল। পশু থেকে মানুষ হল আলাদা। (মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা যা বলেছেন, তার পরিচয় পাবে এই ছবি থেকে)।

মানুষের মত আকারের আদিম প্রাণীর প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগেকার কংকাল পাওয়া গেছে এশিয়া এবং আফ্রিকায়। জার্মানীতে পাওয়া গেছে চার লক্ষ বছরের নরকংকাল। পিকিংয়ের কাছে মিলেছে তিন লক্ষ বছরের কিম্বা তারও অনেক পুরানো মানুষের মাথার খুলি। আরও পরবর্তী কালের মানুষের চিহ্ন পাওয়া গেছে জার্মানী, ফ্রান্স এবং আরও অনেক জায়গায়।

পিকিং মানুষ

চীনের রাজধানী পিকিং' এর কাছে এক পর্বতগুহায় পাওয়া গেছে মানুষের কংকাল, মাথার খুলি, আগুনের ছাই। কংকাল এবং চোয়াল থেকে বোঝা যায় পাঁচ ফুট লম্বা ঐ মানুষরা কথা বলতে পারত। গুহার মধ্যে পাওয়া পশুর হাড় থেকে বোঝা যায় ওরা আগুনে ঝলসানো মাংস খেতে শিখেছিল। মোটা মোটা এবড়ো থেবড়ো পাথরের হাতিয়ারও তারা ব্যবহার করত। **পিকিং মানুষ আগুন জ্বালাতে এবং ব্যবহার করতে পারত,** এটা খুবই বড় কথা। (ছবিতে পিকিং মানুষের মাথার খুলি দেখ)। পিকিং মানুষের খুলি কমপক্ষে ৩ লক্ষ বছর পুরানো।

পিকিং মানুষের মাথার খুলি

আগুন আবিষ্কার ও ব্যবহার

সব প্রাণীই আগুনকে ভয় করে। মানুষও করত। কিন্তু মানুষই আগুনকে কাজে লাগাতে শিখলো। তারা আগ্নেয়গিরির আগুন দেখেছে। দাবানলের আগুনে পোড়া ফলমূল এবং ঝলসানো পশুর মাংস পেটের দায়ে খেয়েছে। কিন্তু তারা দেখেছে ঝলসানোর ফলে মাংস হয়েছে অনেক সুস্বাদু এবং সহজপাচ্য। তবে তো আগুন ব্যবহার করলে ভালই হয়।

লাভা থেকে কিম্বা দাবানলের আগুন থেকে ডালপালা জ্বালিয়ে তারা গুহায় রেখেছে। ক্রমে ক্রমে চকমকি ঘষে নিজেরাই আগুন তৈরি করতে পেরেছে। আগুনের সাহায্যে শীত এবং বন্য পশুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। 'অন্ধকারে আলো পেয়েছে'। খাওয়ার জন্য মাংস ঝলসাতে পেরেছে। ক্রমে ক্রমে রান্না শিখেছে। তারপর ধাতু আবিষ্কারের পরে আগুন দিয়ে ধাতু গলিয়েছে।

খাদ্য সংগ্রাহক মানুষ

প্রথম অবস্থায় মানুষ কিন্তু নিজের ইচ্ছেমত খাদ্য উৎপাদন করতে পারত না। ঘুরে ঘুরে গাছের ফলমূল, নদীর মাছ, কাঁকড়া যোগাড় করেছে। বন্য পশু মেরেছে। যেদিন খাদ্য সংগ্রহ করতে না পেরেছে, সেদিন উপোস করেছে।

হিংস্র পশুর সাথে লড়াই করেই মানুষকে বাঁচতে হয়েছে। হাতের মুঠো, নখ, দাঁত, গায়ের জোর এবং বুদ্ধিই ছিল মানুষের অস্ত্র। আর কোন হাতিয়ার ছিলনা। কোন স্থায়ী বাসস্থানও ছিলনা। যেখানেই ফলমূল পাওয়ার এবং পশু শিকারের সুযোগ ছিল, সেখানেই মানুষ দল বেঁধে চলাফেরা করত। রাত কাটাতো খোলা মাঠে, গাছের ডালে কিম্বা পাহাড়ের গুহায়। এই রকমই ছিল গুহা মানবের জীবন।

হিংস্র পশুর সাথে লড়াই করতে হোত বলে মানুষ দল বেঁধে চলতো। দল বাঁধতে হলে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা দরকার। মুখের শব্দ আর অঙ্গভঙ্গিই হল মানুষের আদিম ভাষা। পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা থেকেই সুরু হল সমাজ জীবন।

যেখানে পশু বেশী পাওয়া যেত সেখানে মানুষের দল বেশী দিন থাকত। পুরুষরা যেত শিকারে। মেয়েরা ঘরের কাজ করত, বাচ্চাদের সামলাতো, শিকারের পশু এলে সকলের মধ্যে মাংস বিতরণ করত। এভাবেই সুরু হল পরিবার জীবন।

সকলে মিলে শিকার করত। শিকারের ভাগ পেত সকলেই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিলনা। পুরুষ আর মেয়ের অধিকারে পার্থক্য ছিলনা। সমাজে শোষণ এবং অসাম্য ছিলনা।

অনুশীলনী

তোমরা ইতিহাস পড়ছ। কোন্ ঘটনা কতদিন আগে ঘটেছিল সে কথা বুঝবার জন্য কিছু সন-তারিখের কথা পরে তোমাদের জানতেই হবে। অনেক সময়ই খ্রীঃ পূঃ (খ্রীষ্ট পূর্ব) এবং ক্রমে ক্রমে খ্রীষ্টাব্দ (খ্রীঃ) কথাটি পাবে। কথা দুটি একটু বুঝে নাও।

বাংলা হিসেবে বছর সুরু হয় বৈশাখ মাসে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও ভিন্ন ভিন্ন নববর্ষ আছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সন তারিখ হিসেব করা হয়। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশের পক্ষেই কোন ঘটনার নির্দিষ্ট সন তারিখ জানতে হলে কী উপায়? সকলের জন্য অভিন্ন সন তারিখ তো দরকার।

খ্রীষ্টানদের মধ্যে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম তারিখ দিয়েই জন্মের আগেকার এবং পরের বছরগুলি হিসেব করা হয়। খ্রীষ্ট ধর্ম যখন সারা পৃথিবীতে ছড়ালো এবং ইউরোপীয়রাও দেশে দেশে গেলেন, তখন সময় হিসেব করবার ঐ পদ্ধতিও সারা পৃথিবীতে ছড়ালো। নিজের দেশে বছর গুনবার নিজস্ব পদ্ধতি এখনো চালু থাকলেও সকলের সুবিধের জন্য খ্রীষ্টের আগে এবং পরে বছর হিসেব করবার প্রথা এখন সব জায়গাতেই মেনে নেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টজন্মের আগেকার সময়কে বলা হয় খ্রীঃ পূর্বাব্দ এবং খ্রীষ্টজন্মের পরের সময়কে বলা হয় খ্রীষ্টাব্দ।

খ্রীঃ পূঃ ১০৫ বললে বুঝতে হবে ঘটনাটি ঘটেছিল খ্রীষ্টজন্মের ১০৫ বছর আগে। অর্থাৎ এখন যদি ১৯৮৪ সন হয় তবে ঘটনাটি ঘটেছিল এখন থেকে ১০৫ + ১৯৮৪ = ২০৮৯ বছর আগে। আর শুধু 'খ্রীষ্টাব্দ' বললে আগেকার কোন সময়ই যোগ করতে হবে না। অর্থাৎ খ্রীঃ ৫০০ বললে বুঝতে হবে এখন থেকে ১৯৮৪ − ৫০০ = ১৪৮৪ বছর আগেকার কথা।

ভাল করে মনে রাখবে:

আদিম মানুষের কংকাল পাওয়া গেছে:

এশিয়া আফ্রিকার কয়েক জায়গায়	৫	লক্ষ	বছর	আগেকার
জার্মানীতে	৪	,,	,,	,,
পিকিং'এ	৩	,,	,,	,,

(অনেকে বলেন পিকিং কংকালই দশ লক্ষ বছর পুরানো)।

৪০ হাজার থেকে ১৬ হাজার বছরের পুরানো কংকাল পাওয়া গেছে অনেক জায়গাতেই।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :—

(ক) পৃথিবীর বয়স কত? (খ) প্রথম অবস্থায় মানুষের কি খাদ্য ছিল? (গ) তখন মানুষ এক জায়গায় থাকত না কেন?

করবার মত কাজ

নিজে কল্পনা করে আদিম মানুষের একখানা ছবি আঁকবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে পরীক্ষা

মোট নম্বর = ১০০ ; সময় ২ ঘণ্টা

১। খুব সংক্ষেপে মুখে মুখে উত্তর দাও :— ২×৫=১০

(ক) পিকিং মানুষ বলতে কি বুঝায়? (খ) কিভাবে মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখল? (খ) খাদ্য আহরণকারী মানুষ বলতে কি বুঝায়? (ঘ) 'গুহাবাসী মানুষ' কথাটির অর্থ কি? (ঙ) মনের কথা বোঝাতে শব্দের সাথে অঙ্গভঙ্গি দরকার হত কেন?

২। প্রতিটির জন্য পাঁচ লাইনে উত্তর লেখ :— ৫×৭=৩৫

(ক) পিকিং গুহা আবিষ্কার থেকে কি বুঝা যায়?

(খ) আগুনের উপকারিতা সম্বন্ধে কি করে মানুষের ধারনা এল?

(গ) কিভাবে আদিম মানুষ আগুন ব্যবহার করল?

(ঘ) খাদ্য আহরণকারী মানুষকে কেন যাযাবর জীবন যাপন করতে হত?

(ঙ) আদিম মানুষ কি কি খাদ্য আহরণ করত?

(চ) ভাষা ও কথা বলবার দরকার হয়েছিল কেন?

(ছ) কি ভাবে ভাষার সৃষ্টি হল?

৩। উত্তর লেখ :— ৪×৮=৩২

(ক) মানুষের সভ্যতায় আগুন আবিষ্কারের গুরুত্ব কী?

(খ) গুহা বাসীদের পারিবারিক ব্যবস্থা কি রকম ছিল?

(গ) আদিম সমাজে শোষণ এবং অসাম্য ছিলনা কেন?

(ঘ) কত বছর আগেকার নরকংকাল কোথায় কোথায় পাওয়া গেছে তার একটি তালিকা দাও।

৪। পশু থেকে মানুষের উদ্ভব কিভাবে হয় এবং মানুষ কেন জীবশ্রেষ্ঠ হল? ৮

৫। খ্রীঃ পূঃ এবং খ্রীঃ বলতে কি বুঝায়? কোন ঘটনা এখন থেকে কত বছর আগে ঘটেছিল, সেই হিসেব কি ভাবে করা যায়? ১৫

তৃতীয় অধ্যায়

পাথরের যুগ

গুহা মানবকে বন্য পশুর সাথে লড়াই করেই বাঁচতে হয়েছে। অথচ পশুর তুলনায় তার গায়ের জোর কম। মানুষ তাই বুদ্ধির জোর লাগিয়ে অস্ত্র তৈরি করে নিল। গাছের ডাল, পশুর হাড়, বড় বড় পাথরের চাঙ্গড় হল অস্ত্র। ক্রমে ক্রমে এইসব প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে নূতন নূতন অস্ত্র তৈরি করে নিল।

কথা বলতে পারা, আগুন ব্যবহার করতে পারা এবং অস্ত্র তৈরি করতে পারা—এই তিনে মিলে সভ্যতার পথ তৈরি করল।

পুরানো পাথরের যুগ

এইমাত্র শুনেছ গাছের ছুঁচালো ডাল এবং ভারি পাথরের চাঙ্গড়ই ছিল প্রথম দিকে অস্ত্র। তারপর তৈরি হল ভারি কুড়ুল, কাটারি আর পাথরের ফলক। কিন্তু মানুষ তো আরও ভাল চায়। তৈরি করল হাতিয়ারের হাতল। নানা ধরনের কাজ করবার জন্য তৈরি করল দাঁতের মত খাঁজ কাটা হাতিয়ার, পাথরের উখা, মাটি খুঁড়বার হাতিয়ার এবং দূর থেকে ছুঁড়ে মারবার অস্ত্র।
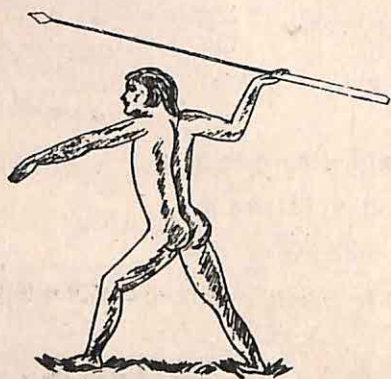
শিকারজীবী মানুষ

এইসব কাজ কতদিন আগে থেকে হয়েছে জান? আজ থেকে এক লক্ষ বছর আগেই হয়েছিল দুদিকে ছুঁচালো জলপাই আকারের হাতিয়ার। তারপর ক্রমেই উন্নতি হয়েছে। চল্লিশ হাজার বছর আগেই মানুষ তৈরি করেছে অনেক হাল্‌কা অথচ বেশী ছুঁচালো অস্ত্র। হাড়ের অস্ত্রও

বানিয়েছে। কুড়ি হাজার বছর আগেকার মানুষ বানিয়েছে ফুটো করবার যন্ত্র, করাত্, বর্শা। (আগেকার পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ তখনকার শিকারী মানুষের কাল্পনিক রূপ। এইভাবেই তারা থাকত)। ষোল হাজার বছর আগে হাতীর দাঁত, হাড়, পশুর শিং দিয়ে অনেক কিছু বানিয়েছে।

পুরানো পাথর যুগে মানুষের তৈরি জিনিস-পত্রের তালিকা শুনবে? লম্বা তালিকার মধ্যে রয়েছে পাথর ঘষবার জন্য অন্য পাথরের হাতিয়ার, কুড়ুল, গর্ত করবার হাতিয়ার, ছিদ্র করবার হাতিয়ার এবং ছুরি, কাটারি, বর্শা, নরুন, মাছের বঁড়শি, হারপুন, পিন প্রভৃতি। (ছবিতে নমুনা দেখ।)
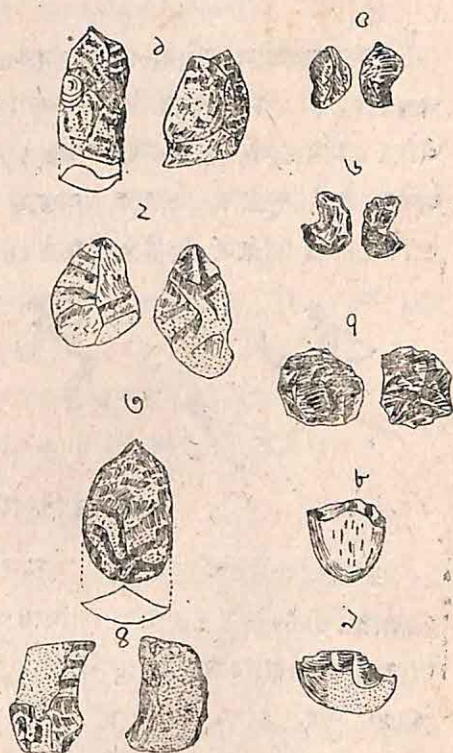
পুরানো পাথর যুগের হাতিয়ার

কিন্তু এইসব হাতিয়ার তেমন পালিশ ছিলনা। এবড়ো থেবড়ো ছিল। দেখতেও সুন্দর ছিলনা। এই সময়টাকে তাই বলা হয় পুরানো পাথরের যুগ। এই ধরনের হাতিয়ার পাওয়া গেছে ভারত, চীন, সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আফ্রিকা ও ইউরোপের নানা দেশে এবং আমেরিকাতেও।

পুরানো পাথর যুগের গুহা চিত্র

ঐ সময়ের মানুষরা কিন্তু ছবি আঁকতেও পারত। শিকারই ছিল তাদের জীবনে মূল কাজ। শিকারের কথাই রয়েছে তাদের আঁকা ছবিতে।

স্পেনের আল্‌তামিরা গুহায় আঁকা রয়েছে বাইসন্ এবং অন্যান্য পশুর ছবি। শিকারের ছবিও আছে। ষোল হাজার বছর আগে আঁকা কোন কোন ছবিতে রং আছে। বেশীর ভাগ ছবিই হল বল্গা হরিণ, বুনো শূয়োর, ভালুক, অন্যান্য খাদ্যপশু, এমনকি অতিকায় প্রাণীর। (ছবিতে একটি গুহাচিত্র দেখ)।

গুহাচিত্রে শিকারের দৃশ্য

ফ্রান্স এবং ইতালীর গুহাতে, আমাদের দেশে মধ্যভারতের রাইসিন জিলার ভিমবেটকাতেও আছে পাথরে আঁকা ছবি। হাড় এবং হাতীর দাঁতেও সে সময়ের মানুষরা ছবি খোদাই করেছিল। বাইসন, বুনো ঘোড়া, বল্গা হরিণ দৌড়াচ্ছে—এইরকম ভাস্কর্যের জিনিসও পাওয়া গেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় পাওয়া গেছে অতিকায় প্রাণীর মূর্তি।

একথা বেশ বোঝা যায় যে পুরানো পাথর যুগের শেষ দিকে, পনের ষোল হাজার বছর আগেই মানুষ বেশ তাড়াতাড়ি সভ্য হচ্ছিল। আরও তাড়াতাড়ি এগলো নূতন পাথর যুগে।

মধ্য পাথর যুগ

পুরানো পাথর যুগ আর নূতন পাথর যুগের মধ্যে কয়েক হাজার বছরকে বলা হয় মধ্য পাথর যুগ। এসময় তৈরি হয়েছে আগে থেকে সূক্ষ্ম বর্শা ফলক, স্লেজ, ছোট ছোট এবং অপেক্ষাকৃত মসৃণ পাথরের

হাতিয়ার। শঙ্খ, ঝিনুক, ঘোড়ার হাড় এবং আরও অনেক জলচর ও স্থলচর প্রাণীর হাড় তখন ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এমন আর একটি কাজও তখন হয়েছে যা মানুষকে সত্যিকারের সভ্য হতে সাহায্য করেছে। সেই কাজটি হল কৃষির আবিষ্কার।

মানুষ তো অনেক রকম ফলমূল মাঠঘাট থেকে সংগ্রহ করত। তার সাথে কখনও এসেছে শস্যের পাকা দানা। শস্য খেয়েছে। খেতেও ভাল, পুষ্টিকরও বটে। তখন থেকে শস্যই হল প্রধান খাদ্য।

কিন্তু শস্যের গাছ কি করে হয় সে কথা তখনই বোঝেনি। নিজেরা তাই শস্য ফলাতে পারেনি। মাঠে ঘাটে যে শস্য মিলেছে, তাই আহরণ করেছে। একজায়গায় আর শস্য না পেলে অন্য জায়গায় চলে গেছে। চাষের কায়দা তখনও মানুষ জানেনি।

যাই হোক, **মধ্য পাথর যুগের মানুষ দুটি বড় জিনিস আবিষ্কার করল**—(১) খাদ্য হিসেবে শস্য এবং (২) জমিতেই শস্য ফলে।

নূতন পাথরের যুগ

মধ্য পাথর যুগ চলেছিল আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে পর্যন্ত। তারপর শুরু হল সভ্যতার আর একটা বড় ধাপ।

কৃষি কাজের সূচনা : পাকা শস্য কুড়িয়ে এতদিন চলছিল। কিন্তু বহু বছরের অভিজ্ঞতায় মানুষ বুঝলো মাটিতে শস্যদানা পড়লে গাছ হয়। সেই গাছে আবার শস্য হয়। মাটি একটু গর্ত করে জল দিলে গাছ বাড়ে তাড়াতাড়ি। **এই হল মানুষের প্রথম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এই হল কৃষিকাজের সূচনা।**

এক জায়গাতেই খাদ্য পাওয়া গেলে, জঙ্গলে জঙ্গলে ফলমূল কুড়োতে কিম্বা পশু হত্যা করতে আর ছোটাছুটি করবে কেন? যেখানেই ভাল জমি, সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে চাষ বাস সুরু হল। মানুষের জীবনযাত্রাই পালটে গেল। খাদ্য আহরণকারীর বদলে সে হল খাদ্য উৎপাদক। আগে ছিল এমন অবস্থা যে যেদিন ফলমূল কিম্বা শিকার না জুটতো সেদিন উপোস করেই

থাকতে হত। এখন আর তেমন হলনা। শস্য সঞ্চয় করতেও মানুষ শিখলো। পিঁপড়েকে তো খাদ্য সঞ্চয় করে রাখতে মানুষ দেখেছে! শিকার থেকে কৃষিতে উন্নতিই হল নূতন পাথর যুগে মানুষের শ্রেষ্ঠ সফলতা।

বিভিন্ন প্রমাণ থেকে মনে হয় কৃষির প্রথম প্রচলন হয় থাইল্যাণ্ড, মেসোপটামিয়া, প্যালেস্টাইনে। প্যালেস্টাইনের জেরিকাতে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে সেই সময়কার অনেক চিহ্ন।

উন্নত হাতিয়ার ঃ নূতন পাথর যুগের অস্ত্র শস্ত্র এবং হাতিয়ারও হল অনেক বেশী কাজের, মসৃণ এবং দেখতেও ভাল।

কৃষিই হয়েছে প্রধান জীবিকা। সুতরাং জঙ্গল পরিষ্কার করবার হাতিয়ার, মাটি চষবার হাতিয়ার, শস্য কাটবার কাস্তে, আসবাব তৈরির হাতিয়ার, চিমটে, বাটালি, করাত, জাঁতা, ভাল বঁড়শি, হারপুন এবং পশু ধরবার ফাঁস তৈরি হল।

চাষবাস চালু হল। কিন্তু পশু শিকারও বাদ গেল না। (আজও আমরা পশু পাখী শিকার করি)। তবে শিকারের অস্ত্র হল অনেক উন্নত। তীর ধনুক চালু হল। পাথর ফুটো করা এবং মসৃণ করা
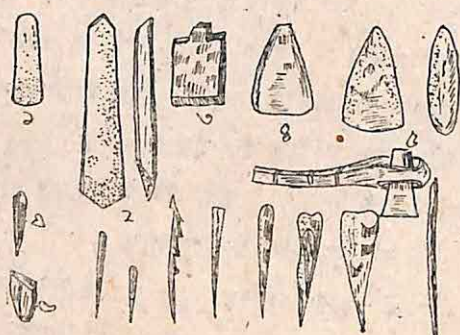
নূতন পাথর যুগের হাতিয়ার

হতে লাগল। কপিকল (পুলি), ঢেঁকিকল (লিভার) এবং মইয়ের প্রচলন হল। ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম পিন, সূচ, টাকু, মাকু এবং তাঁতও হল। সূচ এবং মাকু আবিষ্কারের ফলেই এল কাপড় তৈরির ব্যবস্থা।

(ছবিতে দেখ নূতন পাথর যুগের হাতিয়ার পুরানো পাথর যুগের তুলনায় কত উন্নত হয়েছিল)।

নূতন পাথর যুগে শুধু কৃষিকাজ এবং হাতিয়ারের উন্নতিই হয়নি। বাড়ীঘর, পশুপালন, কুমোর ছুতোরের কাজ, যানবাহন, ভাষা ও লিপি, ধর্ম ও সমাজ—অর্থাৎ সবদিকেই বিরাট পরিবর্তন এল। **এই উন্নতিকেই পণ্ডিতরা বলেন নূতন পাথর যুগের বিপ্লব।** এইসব সফলতার কথা এবার একটু একটু শোন।

বাড়ীঘর ঃ স্থায়ীভাবে বসবাস না করলে কি চাষবাস চলে? মানুষের গুহা জীবন শেষ হল। স্থায়ী ঘরদোর হল। তৈরি হল ঘাসের ছাউনি দেওয়া কাদামাটির ঘর। পাথরের বাড়ীও হল।

সুইজারল্যাণ্ডে আছে অনেক হ্রদ। একবার শুকনোর সময় হ্রদের জল কমে গেল। জলের তলা থেকে বেরিয়ে এল মাচা-বাঁধা অনেক ঘর। ঐসব ঘরে ছিল নূতন পাথর যুগের মত জিনিস-পত্র। হ্রদ বাড়ীর মানুষরা ছুতোরের কাজ ভালই জানতো। গাছের বাকল, ঘাস এবং নল খাগড়া দিয়ে তারা বাড়ীর ছাদ বানিয়েছিল। তারা কপিকল, মই এবং কব্জার ব্যবহারও করেছিল। এ হল নয় হাজার থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা।

আগেই শুনেছ জেরুজালেমে পাওয়া গেছে বাড়ীঘর, হাতিয়ার এবং গ্রামের চারপাশে দেয়াল পর্যন্ত। বুঝা যায় তখনকার মানুষ গ্রাম রক্ষার ব্যবস্থা করতেও শিখেছিল। **কয়েকটি পরিবারের ছাউনি** থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে সুরক্ষিত নগর—এই হল নূতন পাথর যুগে মানুষের একটা বড় কৃতিত্ব।

খাদ্য ঃ হ্রদ বাড়ীর লোকেরা গম, জোয়ার, রাই, বার্লি, ওট, শুঁটি, নানারকমের ফলমূল এবং অনেক রকমের বাদাম ও আপেল খেত। অবশ্য পশুর মাংসও খেত খুবই। পশুর চামড়া ও লোমের পোশাক, গাছের আঁশের কাপড় পরতো। জমিতে সার দিত। বার্চ গাছের বাকল দিয়ে ঝুড়ি বানাত। এসব কথা পরে আরও বলছি। তার আগে শোন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা—পশুপালন।

পশুপালন ঃ হয়তো কোন শিকারী বন থেকে দু'চারটে পশুর বাচ্চা ধরে নিজের বাচ্চাদের খেলতে দিয়েছিল। সেই বাচ্চা বড় হল। তারও বাচ্চা হল। মানুষ বুঝলো বাড়ীতেই পশু পালন করলে শিকারের পিছনে হন্যে হয়ে ঘুরতে হবেনা। পশুর সংখ্যা যত বাড়বে, খাদ্য ততই বেশী মিলবে। পশুকে দিয়ে অনেক কাজও হবে।

আজ থেকে দশ হাজার বছর আগেই পোষ মানানো হল কুকুরকে। তারপর ছাগল, ভেড়া, শূয়োর গরু, বলদ। আরও পরে ঘোড়া এবং গাধা। গরুর দুধ খেয়ে বাছুরকে হৃষ্টপুষ্ট হতে দেখে মানুষও দুধ এবং দুধের তৈরি খাবার খেতে লাগল।

মানুষ কিন্তু তখনও শিকার করা ছাড়েনি। তবে ক্রমেই শিকারের উপর কম নির্ভর করেছে। একদিকে জমি চাষ, অপরদিকে পশু চাষকে (পশু পালন) বলা হয়।মশ্রচাষ। মিশ্রচাষের ফলে বিভিন্ন রকমের খাদ্য হয়েছে প্রচুর। মজার ব্যাপারটা দেখ। মানুষ শ্রম দিয়ে বেশী ফসল ফলিয়েছে। আবার বেশী ফসল পেয়ে বেশী মানুষ খেতে পেরেছে, জনসংখ্যা বেড়েছে। বাড়তি খাদ্য জমিয়েছে বিভিন্ন পাত্রে। এ থেকেই হল মাটির পাত্র তৈরিতে কুমোরের কাজের উন্নতি।

মাটির বাসনপত্র ঃ পুরানো পাথর যুগে মাথার খুলি, নারকেলের মালা, কাঠ কিম্বা পাথরের বাটিতেই জিনিস রাখা হত।

মধ্য পাথর যুগের মানুষ মাটির পাত্র বানাতে শিখলো। কাদার ঢেলা কিম্বা মাটির তৈরি জিনিস সূর্যের তাপে শক্ত হতে তারা দেখেছে। সুতরাং কাদামাটিতে তাপ দিয়ে শক্ত পাত্র বানানো যায়, এই জ্ঞান মানুষের হল।

নূতন পাথর যুগের মানুষ ধূলো কাদার জিনিস আগুনে পুড়িয়ে পাথর (অর্থাৎ পাথরের মত শক্ত জিনিস) বানালো। কয়েকটি জিনিস দিয়ে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস তৈরি হল। মানুষ হল স্রষ্টা। কুমোরের কাজ সুরু হল। এল কুমোরের চাকা। সুরু হল মৃৎশিল্প।

ছুতোর মিস্ত্রীর কাজঃ ঘর তৈরির কায়দা হল। ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ হবেনা ? কাঠের বাড়ী, চাষের লাঙ্গল, তক্তা জোড়া দিয়ে নৌকো, স্লেজ গাড়ী এবং সবশেষে চাকা লাগানো গাড়ী তৈরি হল। গাছের ছুঁচালো ডালকে লাঙ্গল হিসেবে আগে ব্যবহার করা হত। এখন এল কাঠের লাঙল আর নিড়ানি।

কাপড় চোপড়ঃ আদিম অবস্থায় মানুষ থাকত পুরোপুরি ন্যাংটা। ক্রমে ক্রমে পরতে শিখলো গাছের পাতা, পশুর লোম ও চামড়ার পোশাক। পশুপালন এবং টাকু আবিষ্কারের ফলে শিখলো পশম এবং গাছের আঁশ ব্যবহার। সূতোর সাথেই এল মাকু দিয়ে কাপড় বোনা। পাথরের মাকু থেকেই **আরম্ভ হল** শিল্প।

পশ্চিম এশিয়ার অনেক জায়গার মানুষই পশম আর তুলোর পোশাক বানাতে শিখেছিল। ভারতের সিন্ধু অঞ্চলেও পাঁচ হাজার বছর আগে তুলো চাষ হয়েছিল। পশমের ব্যবহার ছিল পারস্যে।

হয়তো বাবুইয়ের মত পাখীর বাসা দেখেই মানুষ বুননের কাজ শিখেছে। (ঘাস বুনে পাটি কিম্বা মাদুর তো আজও তৈরি হয়।) তারপর টাকু আর মাকু হওয়ায় কাপড় বুনবার কায়দা পেল।

চাকার ব্যবহারঃ বাস-ট্রাম-ট্রেনে কলে-কারখানায় আজ দেখছ অনবরত চাকা ঘুরছে। যেখানেই তাড়াতাড়ি চলবার দরকার সেখানেই চাকা। এই চাকা কি করে এল ? অনেক অনেক বছরের অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ চাকা আবিষ্কার করেছে। মানুষ দেখেছে গাছের গুঁড়ি কেটে ধাক্কা দিলে গড়িয়ে চলে তাড়াতাড়ি। এই হল চাকার সূচনা। ঠেলাগাড়ীতে চাকা লাগানো হল। তৈরি হল কুমোরের চাকা। তৈরি হল রথের চাকা। সেই থেকে আজ পর্যন্ত গাড়ীতে কিম্বা যন্ত্রে যেখানেই দ্রুত-গতি দরকার, সেখানেই আছে চাকা। **চাকার আবিষ্কার হল নূতন পাথর যুগের একটা** বড় কারিগরি **আবিষ্কার।**

যানবাহনঃ চাকার কথাতেই যানবাহনের কথা এসে যায়। যাযাবর জীবনে সব কিছু লটবহর মাথায় আর পিঠে করেই মানুষ দূর দূর জায়গায় যেত। ক্রমে ক্রমে তারা স্লেজ গাড়ী ব্যবহার

করে নিজেদের কষ্ট কমালো। পশুকে পোষ মানানোর পরে পশুকে করল ভারবাহী। চাকা আবিষ্কারের পরে হল চাকাওয়ালা
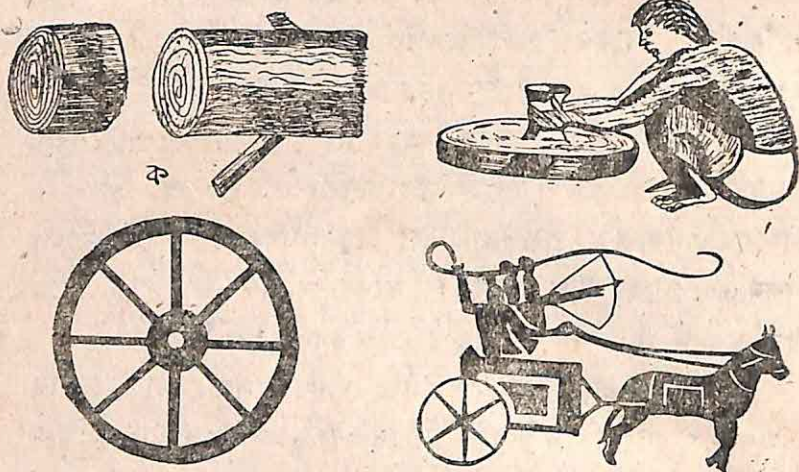
চাকা আবিষ্কার ও ব্যবহার

গাড়ী। গাড়ীতেও পশু জুড়ে দিল। চালু হল বলদ, মোষ, ঘোড়া, গাধার গাড়ী। আজও আমরা বলদের গাড়ীতে মালপত্র বহন করি। গ্রামাঞ্চলে বলদের গাড়ীতে মানুষও যাতায়াত করে।

জলপথে যানবাহন হবে না? গাছের গুঁড়ি বেঁধে হল 'ভেলা'। তারপর কাঠের তক্তা জোড়া দিয়ে নদীতে ভাসান হল। সবশেষে তৈরি হল নৌকো আর শালতি (ক্যানো)।

ভাষা ও লিপি ঃ এতসব কাজ কি পরস্পরের মধ্যে ভালভাবে কথাবার্তা না বলে করা যায়? শব্দের সাথে অঙ্গভঙ্গি মিশিয়ে আগে কাজ চলতো। এখন সুরু হল বিশেষ অর্থে বিশেষ ধ্বনি। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তৈরি হল সুগঠিত ভাষা।

লেখা কি আর বাদ থাকবে? মাটির জিনিসের উপর আঙ্গুল কিম্বা নখের আঁচড় দিয়ে নক্সা করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাই থেকে সৃষ্টি হল অক্ষর অর্থাৎ লিপি। এক একটা ছবি দিয়ে এক একটা কথা বোঝানো হল। একে বলে চিত্র-ভাষা। মাটির

ফলকে, একদিক থেকে আর এক দিকে, একের পর এক ছোট ছোট ছবি এঁকে মনের কথা বোঝানো হল। এই ধরনের অর্থপূর্ণ চিত্র-ভাষা পাওয়া গেছে মিসর, স্পেন, মেসোপটামিয়ায়। সেগুলির বয়স নয় হাজার বছর। ছবি-ভাষাতেই মিসর, সুমেরের পুরোহিতরা মন্ত্রতন্ত্র ব্যবহার করতেন। ছেলেদের লেখাপড়াও হত এই ভাষাতেই। তারপর হাজার হাজার বছর অনুশীলনের ফলে তৈরি হল নানা দেশের নানা ভাষা ও লিপি।

শিল্পকলা-স্থাপত্য-ভাস্কর্য ঃ ছবিতে মনের কথা বলতে পারবার ফল হল চিত্রশিল্পের উন্নতি। নূতন পাথর যুগের মানুষ পাথরের বাড়ী আর স্তম্ভও তৈরি করল। সুরু হল স্থাপত্য শিল্প। পশু মূর্তি এবং নারী মূর্তি থেকে বোঝা যায় তারা ভাস্কর্যেও উন্নতি করেছিল। মাটির পাত্রেও তারা নক্সা এঁকেছে। গুহা-চিত্রও হয়েছে অনেক ভাল। আশা আকাঙ্খা প্রকাশ করেছে গানে নাচে। আজও আদিবাসীদের নাচ আমরা তন্ময় হয়ে দেখি।

ধর্ম ও অনুষ্ঠান ঃ আচার আচরণ, গান নাচ এবং চিত্রের মধ্যেই রয়েছে ধর্মচিন্তার পরিচয়। কেউ মারা গেলে তার অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপত্র, পছন্দের খাদ্য পানীয় সাথে দিয়ে মৃতদেহ কবর দেওয়া হত। তারা ভাবতো মৃত ব্যক্তির আত্মার আশীর্বাদে ভাল ফসল হবে। জীবিতদের মঙ্গল হবে। কোন কোন গাছ এবং প্রাণীকেও মানুষের ভালমন্দের শক্তি মনে করে পূজো করতো। আজও এরকম আছে।

মানুষ তখন কৃষিজীবী। কৃষির জন্য দরকার রোদ, বৃষ্টি, আলো, জমির উর্বরতা। এইসব প্রাকৃতিক শক্তিকেই মঙ্গলময় দৈবশক্তি মনে করে মানুষ পূজো করেছে। প্রচণ্ড খরাকে মনে করেছে শস্যদাতৃ পৃথিবীর মৃত্যু। ফসল হলে মনে করেছে পৃথিবী বেঁচে উঠেছে। সূর্যের তেজ, চাঁদের মাধুর্য সম্বন্ধে অনেক কাহিনীও সৃষ্টি হয়েছে। নানা ধরনের অনুষ্ঠান করে মানুষ "দৈবশক্তির" আশীর্বাদ চেয়েছে। মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক করে একদল লোক গোষ্ঠীকে শাসন করেছে। এরাই পরে হয়েছেন পুরোহিত।

মানুষের জন্ম হয় মায়ের গর্ভে। মাকে আমরা দেবীর মত ভক্তি করি। প্রাণ ধারনের খাদ্য উৎপন্ন হয় যে মাটির গর্ভে, সেই ধরিত্রীকেও মা মনে করি। এই মনোভাব এসেছিল নূতন পাথর যুগেই। বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া নারীমূর্তি থেকেই বোঝা যায় তারা মাতৃপূজো করত।

বর্ষপঞ্জী ঃ বৃষ্টি কখন হবে, জমি কখন চষতে হবে, বীজ কখন বুনতে হবে—এসবও তারা ঠিক করে নিয়েছিল। এই হল প্রাচীন মানুষের বর্ষপঞ্জী।

সমাজ জীবন ঃ নূতন পাথর যুগে উৎপাদন বাড়ল। অবসর বাড়ল। এক জায়গাতেই স্থায়ী বাসস্থান হল। লোকসংখ্যা বাড়ল। পরস্পরের আচার ব্যবহার ঠিক করবার জন্য গোষ্ঠীর নিয়ম কানুন হল। রাজা কিম্বা 'সরকার' তখনও হয়নি। সব চেয়ে যোগ্য ব্যক্তিই হতেন দলনেতা। ধনী দরিদ্রের ঝগড়া তখনও সুরু হয়নি। জমিও ছিল গোষ্ঠীর সম্পত্তি। সুতরাং একজনকে আর একজনের শোষণ করবার উপায় ছিলনা।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে জমি, বাড়ী, আসবাব, গয়না হল পরিবারের সম্পত্তি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতেও বেশী দেরি হল না।

পাথর যুগে মানুষের সাফল্য

এখনকার সাথে তুলনা করলে মনে হবে পাথর যুগের সভ্যতার তেমন কোন দামই ছিলনা। কিন্তু সে সময় মানুষ যা করেছিল, পরের যুগের মানুষ তা থেকেই আরও উন্নত সভ্যতা বানিয়েছে। সুতরাং পাথর যুগের মানুষের কাছে আমরা ভীষণ ঋণী।

পুরানো পাথর যুগের মানুষ দিয়েছে হাতিয়ার, আগুন, চিত্রকলা, ভাষা। বেঁচে থাকাই ছিল তাদের প্রধান সমস্যা। সভ্যতার পথে এগোতে তাদের সময় লেগেছিল প্রচুর।

নূতন পাথর যুগে উন্নতি হয়েছে অনেক বেশী এবং অনেক তাড়াতাড়ি। এ সময়ের মানুষ দিয়েছে খাদ্য উৎপাদনের কায়দা, পশু-

পালন, উন্নত অস্ত্র, মৃৎশিল্প, কাঠের কাজ, বাড়ীঘর, যানবাহন, চাকা, কাপড় বোনার কায়দা, স্থায়ী বাসস্থান, উন্নত ভাষা এবং লিপি, পরস্পরের সহযোগিতার নিয়মকানুন। উন্নত উৎপাদনের ফলে অবসর বেড়েছে। যথেষ্ট খাদ্য পাওয়ায় লোকসংখ্যাও বেড়েছে।

নূতন পাথরের সভ্যতা সবচেয়ে ভালভাবে তৈরি হয়েছিল দক্ষিণ পূর্ব এবং পশ্চিম এশিয়ায়। এই যুগের পরেই মানুষ শিখলো ধাতুর ব্যবহার, লেখা পড়া, রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা। নূতন পাথর যুগের বড় বড় জনপদগুলি তখন পরিণত হল নদী উপত্যকার সভ্যতায়।

পৃথিবীর সব জায়গায় পুরানো, মধ্য এবং নূতন পাথরের সভ্যতা কিন্তু একই সময় একইভাবে আসেনি। কোথাও কোথাও মধ্য-পাথরের যুগ প্রায় আসেইনি। এই অসমতা ছিল বলেই মানব সভ্যতায় বৈচিত্র্য এসেছে।

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে ঃ—

(ক) ১ লক্ষ বছর আগে দুদিকে ছুঁচালো জলপাই আকৃতির পাথরের হাতিয়ার তৈরি হয়েছে। ৪০ হাজার বছর আগে হয়েছে হালকা, সূক্ষ্ম পাথর এবং হাড়ের হাতিয়ার। ২০ হাজার বছর আগেই হয়েছে ফুটো করবার যন্ত্র, করাত, বর্শা প্রভৃতি। ১৬ হাজার বছর আগে হাতীর দাঁত, পশুর শিং এবং হাড় দিয়ে নানারকম হাতিয়ার তৈরি হয়।

(খ) এখন থেকে আট দশ হাজার বছর আগে ধাতুর ব্যবহার চালু হওয়া পর্যন্ত পাথরের হাতিয়ারেরই অনেক উন্নতি হয়েছিল। পাথরের যুগকে পুরানো পাথর, মধ্যপাথর এবং নয়া পাথর যুগ ভাগ করা যায়।

(গ) নয়া পাথরের যুগে শুধু হাতিয়ারের উন্নতিই হল না। এই যুগ থেকেই চাষবাস, বাসস্থান, যানবাহন, লেখাপড়া, পশুপালন ইত্যাদি নানাদিকে বিরাট বিরাট পরিবর্তনকে বলা হয় নয়াপাথর যুগের "বিপ্লব"।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

(ক) পুরানো পাথর যুগ বলে কেন? (খ) মানুষের পক্ষে অস্ত্র দরকার হল কেন? (গ) প্রথম অবস্থায় কি ধরনের হাতিয়ার দিয়ে মানুষ আত্মরক্ষা

করত ? (ঘ) আলতামিরা গুহায় কি পাওয়া গেছে ? (ঙ মধ্য পাথর যুগ বলে কেন ? (চ) মিশ্র চাষ কাকে বলে ?

করবার মত কাজ

একই হাতিয়ার পুরানো এবং নূতন পাথর যুগে কেমন ছিল, অন্ততঃ তিনটি বিষয়ে এঁকে পার্থক্য দেখাবে।

তৃতীয় অধ্যায় থেকে পরীক্ষা

মোট নম্বর = ১০০ ; সময় ৩ ঘণ্টা

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ ১×৮=৮

(ক) প্রাণী অথবা গাছকেও মানুষ পূজো করত কেন ? (খ) পশু পালনের আগে কি ভাবে মানুষ জিনিসপত্র বহন করত ? (গ) পশুপালনের পরে ভারবহনের কি উন্নতি হয়েছিল ? (ঘ) কখন থেকে মানুষের স্থায়ী বসবাস দরকার হল ? (ঙ) প্রথম অবস্থায় কি দিয়ে ঘরবাড়ী তৈরি হত ? (চ) হ্রদ বাড়ী কোথায় পাওয়া গেছে ? (ছ) নূতন পাথর যুগের মানুষ কোন কোন পশু পালন করেছে ? (ক) মাটির পাত্র দরকার হল কেন এবং কখন ?

২। **প্রতিটির উত্তর পাঁচ লাইনের মধ্যে লেখ ঃ—৪×১৪=৫৬**

(ক) মধ্যপাথর যুগে মানুষের প্রধান সাফল্য কী ছিল ? (খ) কিভাবে মানুষ চাষবাস শিখলো ? (গ) নূতন পাথর যুগের হাতিয়ারগুলির বিশেষত্ব কী ছিল ? (ঘ) সূচ এবং মাকু আবিষ্কারের গুরুত্ব কী ? (ঙ) হ্রদ বাড়ী থেকে কি ধারনা করা যায় ? (চ) পশুপালন করে মানুষের কি সুবিধে হয়েছিল ? (ছ) পোড়া মাটির জিনিস বানিয়ে মানুষ হল স্রষ্টা—এই কথাটির অর্থ কি ? (জ) কি ভাবে চাকার উদ্ভব হয় ? (ঝ) চিত্র-ভাষা কতদিনের পুরানো ? (ঞ) প্রাকৃতিক শক্তিকে ভগবান মনে করা হয়েছিল কেন ? (ট) মাতৃ পূজার কি কারণ ছিল ? (ঠ) বর্ষপঞ্জী কিভাবে এল ? (ড) গোষ্ঠী জীবনে নিয়মকানুন শাসন দরকার হল কেন এবং কখন ? (ঢ) পৃথিবীর মৃত্যু ও পুনর্জন্মের কাহিনী কেন চালু হয়েছিল ?

৩। পুরো উত্তর লেখ :— ৫×৭=৩৫

(ক) কথা বলতে পারা, আগুন আবিষ্কার করা এবং অস্ত্র তৈরি করবার ফল কী হল ? (খ) পুরানো পাথর ও নূতন পাথর যুগের মূল পার্থক্য কী ছিল ? (গ) কি ভাবে গ্রাম এবং শহর সৃষ্টি হল ? (ঘ) পুরানো পাথর এবং নূতন পাথর যুগে মানুষের প্রধান প্রধান সাফল্য কী হয়েছিল ? (ঙ) পাথর যুগের কাছে আমরা কিভাবে ঋণী ?

চতুর্থ অধ্যায়

ধাতু যুগের সূচনা=তামা ঃ ব্রোঞ্জ

পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে। তার পর বেশীর ভাগ সময়ই ছিল আদিম যুগ। তারও পরে, পাথর যুগ পেরিয়ে, আজ থেকে আট হাজার বছর আগে একটু একটু করে এসেছে ধাতুর যুগ। তখন থেকেই সভ্যতার প্রকৃত সূচনা হয়েছে।

তামা ঃ মানুষ সবচেয়ে আগে ব্যবহার করেছে তামা। বোধহয় সুইজারল্যাণ্ডেই প্রথম। তারপর ক্রমে ক্রমে মেসোপটামিয়া, মিসর ও ভারতে। অবশ্য যেদিন ধাতু আবিষ্কৃত হল সেদিন থেকেই 'ধাতুর যুগ' ধরা যায় না। **যখন ধাতু দিয়ে মানুষ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বানিয়েছে, তখন থেকেই সুরু হয়েছে ধাতু-যুগ।**

প্রথম প্রথম মানুষ হয়তো আগ্নেয়গিরি, দাবানল কিম্বা পাথর ঘষা আগুনের তাপে মাট কিম্বা পাথরের সাথে মেশানো তামা গলতে দেখেছে। সুতরাং বলা চলে তামার আবিষ্কার হয়েছে হঠাৎ। কিন্তু মানুষ দেখল সেই ধাতুটি দিয়ে অনেক জিনিস বানানো যায়। তখন নিজেই চেষ্টা করে তামা গলাতে লাগল। সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগেই আকরিক পিণ্ড থেকে তামা বার করতে শিখলো। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে তামা ঢালাই করতেও পারল।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব পাড়ের দেশগুলিতে প্রচুর তামা পাওয়া যেত। সে জন্যই এলাম, মেসোপটামিয়া, মিসরে সভ্যতার নূতন যুগ আরম্ভ হল। ওখানে থেকেই নানাদিকে ধাতুর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ল। **মানুষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির চেহারাই পালটে গেল।**

ব্রোঞ্জ ঃ মানুষ দেখল তামা হল নরম ধাতু। সহজেই বাঁকানো যায়। কি করা যায়? পাওয়া গেল তামার সাথে টিন কিম্বা দস্তা মেশানো প্রাকৃতিক ব্রোঞ্জ। ব্রোঞ্জ হল অনেক মজবুত, অনেক বেশী কাজের। মানুষ তখন নিজেই ব্রোঞ্জ তৈরি করল ক্রীট দ্বীপে, মিসরে এবং অন্যান্য জায়গায়।

আমরা "তামা যুগ" বলি। কিন্তু "ব্রোঞ্জ যুগ" কথাটা সব দেশের পক্ষে খাটেনা। পাথর যুগের পরে, লোহা যুগের আগে পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার হয়েছে। কোথাও কোথাও ব্রোঞ্জের ব্যবহার হয়েছে খুবই কম। কোথাও বা একেবারেই হয়নি, যেমন ফিনল্যাণ্ড, মধ্য আফ্রিকা, জাপান ও দক্ষিণ ভারতে।

ব্রোঞ্জ তৈরির তামা এবং টিনও সব জায়গায় যথেষ্ট পাওয়া যেতনা। অল্প যেটুকু ব্রোঞ্জ তৈরি হত, সেটুকুও লাগত রাজা, অভিজাত এবং পুরোহিতদের বিলাসিতায়। গরীব মানুষকে পাথর নিয়েই খুশী থাকতে হত।

তাহলেও পাথর যুগের তুলনায় ধাতু যুগ হল খুবই ভিন্ন ধরনের। ধাতু ব্যবহারের ফলে মানুষের জীবন এবং জীবিকাই পালটে গেল।

শহরের উৎপত্তি : পাথরের যুগ ছিল শিকার, চাষবাস এবং গ্রামকে ভিত্তি করে। তামা ব্রোঞ্জের যুগে অনেক কারিগর কারখানা সাজালো। অনেক ব্যবসায়ী দোকান খুললো। অল্প জায়গাতেই ঘন বসতি তৈরি হল। অল্প জায়গার মধ্যেই প্রয়োজনীয় সব জিনিস পাওয়া গেল। দূর দূর থেকে বণিকরা এল কেনা বেচার কেন্দ্রে। সৃষ্টি হল দেয়াল-ঘেরা শহর বন্দর। এভাবেই সৃষ্টি হল প্রাচীন শহর নিপুর, কিস্, উর, উরুক, নিশিন্, সুসা, মেমফিস, কার্নক, থিব্‌স, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, লোথাল।

উৎপাদনে নূতনত্ব : ধাতুর যুগে শুধু কৃষির উপরই নির্ভরতা রইলনা। ছোট ছোট কারখানা হল। বিভিন্ন ধরনের কারিগর লাগল। পাথর কাটবার মিস্ত্রী, মূর্তি তৈরির কারিগর, আসবাব তৈরির মিস্ত্রী, গয়না তৈরির কারিগর, হাতীর দাঁতের কারিগর, তামা টিন ব্রোঞ্জের কারিগর, কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির ওস্তাদ হল অনেকে। সোনা রূপোর কর্মকার, ধাতুর বাসন তৈরির কারিগর, নৌকোর মিস্ত্রী, সূতো কাটা এবং তাঁত বুনবার কারিগরও হল অনেকে।

ব্যবসা বাণিজ্য : কাজগুলি ভাগ হল। বিশেষ বিশেষ মানুষ বিশেষ বিশেষ জিনিস বানাতে লাগল। নিজেদের দরকারী অন্যান্য

জিনিস নিতে হল অন্যের কাছ থেকে। এইভাবেই সুরু হল বিনিময়। ক্রমে ক্রমে বিনিময়ের ব্যবসা গ্রাম শহরের সীমানা ছাড়িয়ে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ল। যে জিনিসের অভাব, সেই জিনিস আনা হল অন্যের কাছ থেকে। নিজের উৎপন্ন জিনিস দিতে হল অন্যকে। জিনিসের বদলে জিনিস দিয়েই বিনিময় বাণিজ্য হল অনেক দিন ধরে।

কিন্তু দূর দূর অঞ্চলের সাথে বেশী বেশী জিনিস আমদানি রপ্তানি করতে গিয়ে জিনিসে জিনিসে বিনিময় সম্ভব হলনা। তখনই সুরু হল দর-দাম এবং সোনা, রূপোর মত মূল্যবান ধাতুর হিসেবে বিনিময়।

স্থলপথে যেমন বাণিজ্য হল, নদী এবং সমুদ্র পথেও তেমনি হল। তৈরি হল বাজার ও বন্দর, যেন এক জায়গায় বসেই বিক্রেতা বিক্রি করতে পারে, ক্রেতা কিনতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেন করেই সৃষ্টি হল বণিক শ্রেণী।

শোষণ ও দাসশ্রম ঃ পাথর যুগের মানুষরা পরিশ্রম করে শিকার করেছে, ফসল ফলিয়েছে। যা পেয়েছে সকলে মিলে ভোগ করেছে। কিন্তু সে রকম সমতার অবস্থা বরাবর রইলনা। প্রথমে সব সম্পদ ছিল গোষ্ঠীর। তারপর সম্পদ হল পরিবারের। শেষে সম্পত্তি হল ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ফলে মানুষের জীবন ও সমাজের ধরনই বদলে গেল।

নিজের বেশী জমি থাকলে বেশী ফসল হবে, নিজের সম্পদ বাড়বে। শিল্পদ্রব্য বিক্রি করে মুনাফা হলে লাভটুকু হবে একেবারে নিজের। যত কম খরচে যত বেশী উৎপাদন এবং বিক্রি করা যাবে, ততোই বেশী হবে ব্যক্তিগত লাভ, সঞ্চয় এবং সম্পদ।

জমিহীম, কারখানাহীন লোককে জমি ও শিল্পে খাটালে উৎপাদন বাড়বে। মালিকের মুনাফা বাড়বে। এজন্যই, যারা মালিক নয় তাদের অতিরিক্ত খাটিয়ে মালিকরা অতিরিক্ত উৎপাদন করাতে লাগল। উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিল না। এইভাবে সুরু হল শোষণ।

ইচ্ছেমত জোর জুলুম করে খাটানো যায় এবং প্রতিদানে তেমন কিছুই দিতে হয় না, এমন লোক পেলে তো মালিকের আরও

মজা ! কিছু লোককে 'দাস' বানাতে পারলেই হয়। **স্থুরু হল দাস প্রথা এবং দাসশ্রম।** দরিদ্রের দাসত্বে বাঁধা হল। যুদ্ধবন্দীদেরও দাস বানানো হল বংশ পরম্পরায়। সমাজের মধ্যে ধনী দরিদ্র, মালিক অমালিক, প্রভু ও দাসের এক বিশ্রী শ্রেণী বিভাগ সৃষ্টি হল।

বেশী জমি হলে বেশী লাভ। তামা, দস্তা, টিন, সোনা, রূপোর খনি যত দখল করা যাবে, ততই হবে সম্পদ। অন্যান্য গোষ্ঠীর জমি আর খনি দখল করলেই জমির সীমানা বাড়বে, সম্পত্তি বাড়বে। কিন্তু লড়াই ছাড়া তো হবে না ! **শান্ত সমাজে স্থুরু হল গোষ্ঠী গোষ্ঠী ঝগড়া।** যুদ্ধে যারা বন্দী হত, প্রথম প্রথম তাদের মেরে ফেলা হত, কারণ বন্দী করে রাখলে খেতে দিতে হবে তো। তারপর যখন দেখল ওদের দাস বানালে অনেক কাজ পাওয়া যাবে, তখন থেকে এক ঢিলে **দুটি পাখী মারা হতে লাগল—জমিজায়গা দখল এবং দাস সংগ্রহ।**

রাষ্ট্রের জন্ম : যুদ্ধ করতে অস্ত্র চাই, সৈন্য চাই। গরীব মানুষ এবং দাসদের শায়েস্তা রাখতে বরকন্দাজ চাই। আইন কানুন এবং সাজার ব্যবস্থা চাই। এইভাবে আস্তে আস্তে তৈরি হল রাষ্ট্রের রূপ।

অনেক সময় বিভিন্ন গোষ্ঠী পরস্পর মিশে গিয়ে বড় গোষ্ঠী হল। অনেক সময় ছোট ছোট গোষ্ঠীকে পরাজিত করেও কোন কোন গোষ্ঠী খুব বড় আর শক্তিশালী হল। এইভাবেই সৃষ্টি হল প্রাচীন পৃথিবীর নদী উপত্যকায় বড় বড় গোষ্ঠীর রাজ্যগুলি।

নদী উপত্যকা সভ্যতার উদ্ভব : বড় বড় নদীর স্রোতের সাথে প্রচুর পলি এসে নদীর পাশের জমিকে উর্বর করে। চাষবাসের স্থবিধে হয়। নদীর পাড়ে বনসম্পদ পাওয়া যায়, শিকারও মিলতে পারে। নদী পথে বাণিজ্য চলতে পারে। নদীর মোহনা থেকে সমুদ্রেও বাণিজ্য জাহাজ ভাসানো চলে। এরকম জায়গাতেই তো স্থায়ীভাবে থাকা স্থবিধে। যদি সেখানে ধাতুর খনি থাকে, তবে তো সোনায় সোহাগা !

এইসব কারণেই প্রাচীন যুগে মানুষের সভ্যতার কেন্দ্র হয়েছিল কয়েকটি নদী উপত্যকা—অর্থাৎ নদী বিধৌত অঞ্চল। পশ্চিম

এশিয়ার ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী, উত্তর আফ্রিকার নীল নদ, পশ্চিম ভারতে সিন্ধু নদ, চীনে হোয়াংহো এবং ইয়াং-সিকিয়াং নদীর
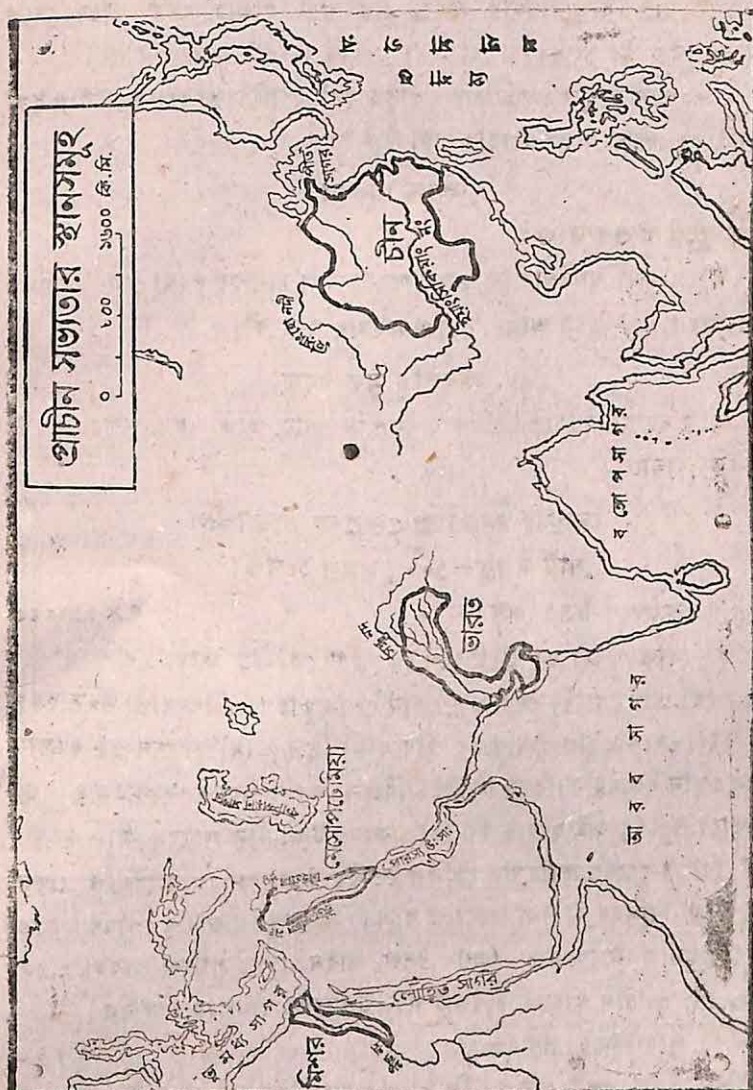
অববাহিকায় সৃষ্টি হয়েছিল সভ্যতার বড় বড় কেন্দ্র। (মানচিত্রে এইসব জায়গাগুলি মিলিয়ে নাও)। নদীর অববাহিকায় সৃষ্টি হয়েছিল বলেই এদের বলা হয় নদী-উপত্যকার সভ্যতা।

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে :—

১। মানুষ ধাতু ব্যবহার করেছে মাত্র আট হাজার বছর আগে থেকে (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ থেকে)। প্রথম ব্যবহার করেছে তামা।

২। তবে মানুষের সভ্যতায় 'ধাতুর যুগ' কথাটি সত্য হলেও "ব্রোঞ্জ যুগ" কথাটি সব দেশের পক্ষে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :

(ক) তামা আবিষ্কার কি ভাবে হয়েছে বলে মনে হয়? (খ) ব্রোঞ্জ কিভাবে তৈরী হয়? (গ) এখন আমরা ব্রোঞ্জ ব্যবহার করি কী?

করবার মত কাজ

যে যে ধরনের তামার জিনিস এখনও ব্যবহার হতে দেখ, তার একটা তালিকা বানাবে।

চতুর্থ অধ্যায় থেকে পরীক্ষা

মোট নম্বর = ১০০ ; সময় ২ ঘণ্টা

১। সংক্ষেপে উত্তর লেখ :— ৫ × ১১ = ৫৫

(ক) ধাতু ব্যবহারের প্রথম যুগে কোথায় কোথায় তামা বেশি পাওয়া যেত? (খ) তামা আবিষ্কারের ফলে কোন কোন জায়গায় জীবনযাত্রা উন্নত হয়? (গ) তামা থেকে ব্রোঞ্জ ব্যবহারের সুবিধে কী ছিল? (ঘ) ধাতুযুগ সুরু হওয়ায় কোন কোন ধরনের কারিগর মিস্ত্রীরা বিশেষ কাজ করতে লাগলেন? (ঙ) কী ভাবে শহরের সৃষ্টি হয়েছে? (চ) কয়েকটি প্রাচীন শহরের নাম লেখ। (ছ) বিভিন্ন ধরনের কারিগরি জিনিস তৈরির ফলে ব্যবসা বাণিজ্যও বাড়ল কেন? (জ) বিনিময় বাণিজ্য কাহাকে বলে? (ঝ) মানুষ মানুষকে শোষণ করতে আরম্ভ করল কখন থেকে? (ঞ) সৈন্য, আইনকানুন, শাস্তির ব্যবস্থা লাগল কেন? (ট) প্রাচীন কালের কয়েকটি নদী-উপত্যকা সভ্যতার নাম বল।

২। পুরো উত্তর লেখ :— ৯ × ৫ = ৪৫

(ক) বণিক শ্রেণী সৃষ্টি হল কি ভাবে? (খ) কিভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হল? (গ) দাস ব্যবস্থার সৃষ্টি হল কেন? (ঘ) ধাতুর যুগে ছোট ছোট গোষ্ঠীর বদলে বড় বড় রাজ্যের উদ্ভব হল কেন? (ঙ) নদী উপত্যকাতেই সভ্যতার বড় বড় কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল কেন?

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীনকালে নদী-উপত্যকার সভ্যতা

প্রাচীন সভ্যতার চারটি কেন্দ্রের নাম শুনেছ—মেসোপটামিয়া, মিসর, ভারত, চীন। এসব জায়গায় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল প্রায় ৬ হাজার বছর থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। এদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু শোন।

(ক) মেসোপটামিয়ার সভ্যতা

অবস্থান ঃ মানচিত্রে দেখ ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী। পাহাড় থেকে বেড়িয়ে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। এই নদী দুটির

ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস-এর সভ্যতা (মেসোপটামিয়া)
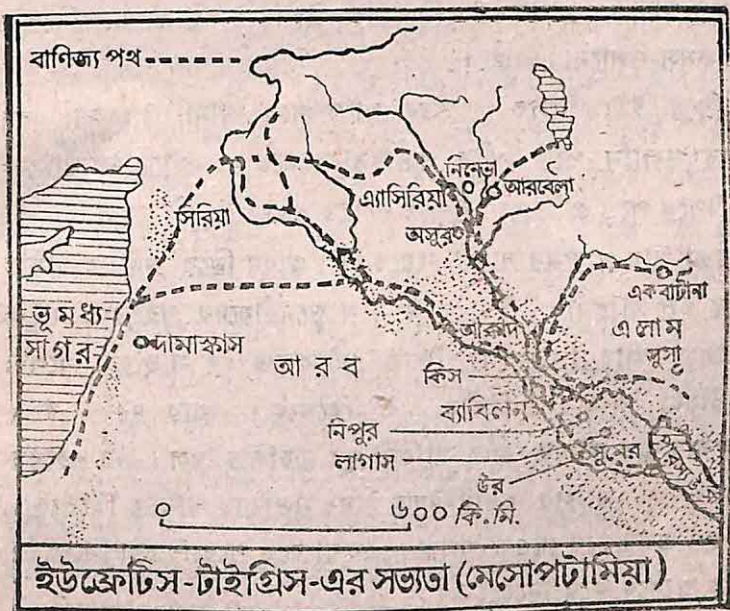
পাড়ে, পারস্য উপসাগরের কাছে সৃষ্টি হয়েছিল মেসোপটামিয়ার সভ্যতা। সুমেরিয়া অথবা সুমের নামের পরিচিত এই জায়গার সভ্যতাকে **সুমেরীয় সভ্যতাও** বলে।

বয়স : কতদিন আগে এই সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল? সুমের অঞ্চলে কুড়ি হাজার বছরের পুরানো নরকংকাল পাওয়া গেছে। শিকারীর যাযাবর জীবনের বদলে এখানে মানুষ স্থায়ী বসবাস গড়ে নিয়েছিল। টাইগ্রিস নদীর পাড়ে সুসা নগরের চিহ্ন পাওয়া গেছে। নিপুর-এ ৬৬ ফুট মাটির নীচে প্রায় সাত হাজার বছর আগেকার চিহ্ন মিলেছে। কিস্, উর, ইউফ্রেটিসের পাড়ে এরিডু. উরুক, লার্সা লাগাস্, নিসিন্ও ছিল বর্দ্ধিষ্ণু শহর। এদের বয়স ঠিক করেছেন পণ্ডিতরা।

অন্যান্য সভ্যতার বিচার করে **পণ্ডিতরা বলেছেন মেসোপটামিয়া সুমেরেই মানুষের প্রথম সভ্যতার আলো জ্বলেছিল।**

নদীর বন্যা এবং জমির উর্বরতা : ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস নেমে এসেছে উঁচু জায়গা থেকে সমতলে। নদীর জলের ঢলের সাথে এসেছে পলি। দু'পাড়ের জমি হয়েছে উর্বর। এই রকম জমিতেই তো ফসল ফলানো সোজা!

কিন্তু ইউফ্রেটিসের স্রোতের সাথে বয়ে আনা পাথরকণা এবং বালির তলানি পড়ে নদীর গভীরতা কমেছে। নদীতে ঢল নামলে জল উপচে পড়ে প্রতি বছরই সৃষ্টি হয়েছে বন্যা।

বন্যা আর প্লাবনের সংকট হয়েছে বলে প্লাবন নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল অনেক গল্প কাহিনী। ঈশ্বরের আদেশে সুমেরীয়দের পূর্বপুরুষ নাকি নলখাগড়া আর বিটুমেনের তৈরি নৌকোতে ভেসে ছলেন বলেই সুমেরীয়রা আবার পৃথিবীর মুখ দেখেছে। প্রায় ৪৫০০ বছর আগেকার এক ভয়ঙ্কর বন্যার কাহিনী খুব প্রচলিত ছিল। উর শহরের নীচে ৮ ফুট বালির তলায় উন্নত মানব সভ্যতার পরিচয় মিলেছে। বন্যা হল ভগবানের দেওয়া শাস্তি—একথা বলে পুরোহিতরা নিজেদের অনেক সুবিধে করে নিয়েছেন।

উর্বর জমি। অথচ বন্যায় সব কিছু ভাসিয়ে নেয়। মানুষ কি করবে? সুমেরীয়রা ছয় হাজার বছর আগেই **সেচের খাল** কেটে সারা বছর জল ধরে রেখেছেন। বাড়তি জল নিষ্কাশন করে দিয়েছেন।

জমিতে বাঁধ দিয়ে জমিকে বন্যা থেকে বাঁচিয়েছেন। এক একটি সেচ খাল ছিল ২৫ মিটার পর্যন্ত চওড়া। খালের পথে নৌকো করে ব্যবসার মালপত্র দেওয়া-নেওয়া করেছেন। **সেচের উপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছিল সুমেরীয় সভ্যতা।**

কৃষির ফলন : পলিমাটির উর্বর জমিতে বার্লি, গম, খেজুর হয়েছে প্রচুর। আঙ্গুর ফলেছে। তরকারি হয়েছে নানা রকমের। নদী আর খালে ছিল মাছ। ভেড়া, ছাগল, গরুও তাঁরা পুষেছেন। বলদে টানা লাঙ্গল দিয়ে চাষ হত। পোড়ামাটির কাস্তে ছিল। শস্য মাড়াইয়ের কায়দাও সুমেরীয়রা জানতেন।

অন্যান্য বৃত্তি : সুমেরীয় কৃষকরা পোড়ামাটির কাস্তে এবং বলদের হাল-লাঙ্গল ব্যবহার করতেন। কৃষির যন্ত্রপাতি তৈরি করাও ছিল বিশেষ বৃত্তি। কারিগররা চামড়া, গাছের আঁশ এবং ক্রমে ক্রমে পশম ও তুলোর কাপড় বুনেছেন। জিনিসপত্রের মান ঠিক রাখবার জন্য সরকারী পরিদর্শন ছিল। ব্যবসায়ের নিয়ম-কানুনও ছিল।

সুমেরীয় কারিগররা তামা, টিন এবং কখনো ব্রোঞ্জ ব্যবহার করতেন। ধাতুর মূর্তি, খোদাই করা আসবাব, সুন্দর বাসনপত্র, সোনা-রূপোর নেকলেস্, বালা ইত্যাদি তৈরি করতে পারতেন। কুমোরের তৈরি মাটির জিনিসের তখন চলন ছিল। সুমেরীয়রাই প্রথম চাকা ব্যবহার করেন, কাঁচের জিনিস তৈরি করেন। হাড় এবং হাতীর দাঁতের সূচ থেকে বোঝা যায় তাঁরা সূক্ষ্ম সূচের কাজও জানতেন।

তা হলে আমরা এখন বলতে পারি কৃষি, পশুপালন, ছুতোর মিস্ত্রী এবং ধাতু শিল্পীর কাজ, পাথর কাটা, সুতো কাটা, তাঁত বোনা, কুমোরের কাজ, সোনা-রূপোর কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, নৌকো ও জাহাজ চালানো প্রভৃতিই ছিল সুমেরীয়দের জীবিকার পথ।

ব্যবসা বাণিজ্য : সুমেরীয়দের ঐশ্বর্য অনেকটাই এসেছিল বিদেশ বাণিজ্য থেকে। দেশের মধ্যেও পণ্যের বেচাকেনা চলতো তবে শিল্পের জন্য পাথর, কাঠ, সোনা, রূপো এবং অন্যান্য ধাতু আসত বিদেশ থেকে। ইউফ্রেটিসের স্রোতে ভাসিয়ে আনা হত কাঠ। উর

থেকে জাহাজ যেত পারস্য উপসাগরে এবং ভারতেও। এসব জায়গা থেকে সুমের নিত তামা, মূর্তি তৈরির কালো পাথর, নীল পাথর। কবরের মধ্যে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র, হাতিয়ার এবং সোনার গয়না দেখেই বোঝা যায় সুমেরীয়দের এইসব মূল্যবান ধাতু ছিল অঢেল।

সুমের থেকে রপ্তানি হত খাদ্যশস্য এবং সুমেরে তৈরি জিনিস। ভারত ও মিসরের সাথে বাণিজ্য ছিল।

যানবাহন ঃ ব্যবসা বাণিজ্য বাড়লে যানবাহনের উন্নতি হবেই। মাটিতে চলতো চাকা লাগানো গাড়ী। নদী ও খালে চলতো নৌকো। কাঠের গুঁড়ির ভেলার সাথে হাওয়া ভর্তি চামড়ার ব্যাগ বেঁধেও ভাল ভেলা তৈরি হয়েছিল। এই ভেলাকে বলে "কেলেক"।

মন্দির ঃ মাটি খুঁড়ে দেখা গেছে সুমেরীয় শহরগুলি ছিল দেয়াল ঘেরা। শহরের মাঝখানে থাকত একটা সুরক্ষিত "পবিত্র অঞ্চল" অর্থাৎ দেবস্থান। সেখানেই বানানো হত মিনারের মত উঁচু নগর দেবতার মন্দির। শহরবাসীরা অনুভব করতেন ভগবান তাঁদের সাথেই আছেন। এই মন্দিরকেই বলা হয় 'জিগুরাট'। উর শহরের জিগুরাট ছিল ২০ মিটার উঁচু। সূর্য এবং চন্দ্র দেবতার মন্দিরও এখানে থাকত। প্রতিটি মন্দিরেই থাকতেন পুরোহিত।

আমদানি করা রঙীন পাথর এবং সোনা রূপো দিয়ে দেবমন্দির বানানো হত। উর শহরে নান্নার দেবতার মন্দিরে ছিল মূল্যবান ধাতু, মার্বেল পাথর, সেডার ও সাইপ্রাস কাঠের কাজ।

বাড়ী ঘর ঃ নগর দেয়ালের মধ্যে এবং বাইরেও ছিল নানা আকারের বাড়ী। ধনীদের বাড়ী ছিল বড় বড়। সব বাড়ীতেই ভিতরের উঠোনের চারপাশে ঘোরানো থাকত ঘর। কাদামাটি, নল-খাগড়া, তাল খেজুরের পাতা প্রচুর পাওয়া যেত বলে এইসব জিনিস দিয়েই ঘর তৈরি করা হত। তারপর তৈরি হল খাগড়ার খিলান্। আরও পরে এল রোদে পোড়া ইট এবং সবশেষে আগুনে পোড়া ইট।

আমদানি করা পাথর বেশীর ভাগই লাগান হত মন্দিরে।

সুমেরীয়রা পাথর কাটা, পালিশ করা, পাথর বসানো এবং নক্‌সা করায় ওস্তাদ হয়েছিলেন।

ধনীদের ইটের প্রাসাগুলি তৈরি করা হত দুর্গের মত করে। প্রাসাদের দেয়ালে ছিল টেরাকোটা এবং দেয়াল চিত্র। সব বাড়ীতে কুয়োর জল তোলা এবং নোংরা জল বার করবার ব্যবস্থা ছিল।

ধনীদের প্রাসাদের পাশেই কিম্বা শহরের বাইরে ছিল শিল্পী কারিগরদের বস্তি বাড়ী। বাড়ীতেই তাদের গরু, ভেড়া, ছাগল, শূয়োর চড়ে বেড়াত। একই ঘরে এদের নিয়ে মানুষ থাকত।

ধর্ম-বিশ্বাস ঃ প্রত্যেক শহরেই ছিলেন একজন নগর দেবতা। তিনিই ছিলেন সব জমি ও খাজনার মালিক। তাঁর নামেই আইন-কানুন জারি করা হত। প্রধান দেবতা সামাস্ ছিলে সূর্য দেবতা।

নিপুরে ছিল দেবতা এনলিল এবং দেবী নিনলিলের মন্দির। উরুক'এ পূজো করা হত মা ধরিত্রীকে। কিস্ এবং লাগাস'এ পূজো করা হত শস্যের দেবতাকে। সেচের দেবতা, বন্যার দেবতাও ছিলেন। দেবতাদের জন্য উৎসর্গ করা হত বলদ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি, পায়রা, মাছ, খেজুর। এতসব জিনিস মন্দিরে জমা হত বলেই পুরোহিতরা ছিলেন দেশের সবচেয়ে ধনী এবং ক্ষমতাবান।

লিপি ঃ সুমেরীয়দের একটা বড় কৃতিত্ব ছিল 'কুনীফর্ম' লিপি। বিভিন্ন ছবি দিয়ে জিনিস, নাম, মনের ভাব বোঝানো হত। ক্রমে

সুমেরের কুনীফর্ম লিপি

1 = ▽
10 = ◁
60 = ▽
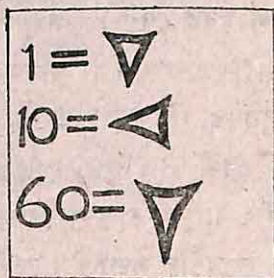
সুমেরের সংখ্যা

ক্রমে বোঝানো হল বিশেষ শব্দ। ছুঁচালো খাগডা দিয়ে মাটির প্লেটে ডান থেকে বাঁ দিকে দাগ কেটে লেখা হত। পরে সেগুলি

পোড়ানো হত। একখানা প্লেট ছিল একখানা 'পৃষ্ঠার' মত। এখন থেকে ৫৫০০ বছর আগেই সুমেরীয়রা লিপি সৃষ্টি করেছিলেন। ৫২০০ বছর আগে মাটির প্লেটে লিখতে পেরেছিলেন। ৪৭০০ বছর আগে পোড়ানো প্লেটের গ্রন্থাগার বানিয়েছিলেন। প্রায় ৩০ হাজার খানা "পৃষ্ঠা" পাওয়া গেছে। ঐসব পৃষ্ঠায় সুমেরের ইতিহাসও কিছু লেখা আছে। লেখাগুলির বেশীর ভাগই অবশ্য ব্যবসায়ের হিসেব পত্র। তাঁরা গণিতের সংখ্যাও সৃষ্টি করেছিলেন।

এইসব লেখার অর্থ কি করে বোঝা গেল ? সেও এক আশ্চর্যের কাহিনী। একটা পাহাড়ের গায়ে এক'শ মিটার উপরে ঐরকম লেখা খোদাই করা দেখে হেনরি রলিন্‌সন্ নামের এক পণ্ডিত ব্যক্তি দিনের পর দিন ঐ পাহাড়ে উঠে সেগুলি নকল করে আনেন। তারপর ১২ বছরের চেষ্টায় ঐ লেখার অর্থ আবিষ্কার করেন। **লেখার প্রচলন করে সুমেরীয়রা মানুষের সভ্যতায় বিরাট দান রেখে গেছেন।**

রাষ্ট্রশক্তি ঃ সুমেরীয়দের আইন কানুনও ছিল। রাজাই ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান। ৪৫০০ বছর আগে কয়েকটি গোষ্ঠি নিয়ে সুমের রাজ্য সৃষ্টি হয়। রাজা সার্গন এবং তাঁর নাতি নরমসীন আরও রাজ্য জয় করেন। ঐ নব রাজ্যে তামা, সীসা, দস্তা সোনা, রূপো এবং কাঠ পাওয়ায় সুমের হল আরও শক্তিশালী।

সমাজ ব্যবস্থা ঃ তবে সুমেরীয় সমাজে **ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ছিল খুবই বেশী।** সমাজের মাথায় ছিলেন রাজা। তার পরেই পুরোহিত, সরকারী আমলা, লেখক। তৃতীয় স্তরে বণিক, জমিদার, কারিগর, চিকিৎসক ইত্যাদি। সবচেয়ে নীচে ছিল দাসরা। দাসপ্রথা খুব বেশী প্রচলিত হয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তিও ছিল "পবিত্র", অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দেওয়া যেতনা।

সুমেরীয় সভ্যতার ত্রুটি ঃ সুমেরীয়দের উন্নতির সুফল সকলে সমানভাবে ভোগ করতে পারেনি। **ধনীরা বিলাসিতা করেছেন। অন্যরা করেছেন কঠোর শ্রম।** শাসকরা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। পুরোহিতদের ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য ছিল খুব বেশী। দাস ব্যবস্থার

ফলে পশুর মত পরিশ্রম করেও বহু মানুষকে পশুর মতই থাকতে হয়েছে।

মানব সভ্যতায় সুমেরীয়দের দান : অনেক দোষত্রুটি সত্ত্বেও সুমেরীয়াই ছিলেন অনেক বিষয় 'প্রথম'। প্রথম রাষ্ট্র এবং প্রথম সাম্রাজ্য তাঁরাই স্থাপন করেন। সেচ-ব্যবস্থা, বাণিজ্যের চুক্তি, সুদে টাকা লগ্নী, আইন-কানুন, লিপি ও লেখা, গ্রন্থাগার এবং মাটির পাতার বই, গয়না গাঁটি, ভাস্কর্য ও দেয়াল চিত্র, প্রাসাদ ও মন্দির, পাথরের কারিগরি—সবই মানুষের সভ্যতায় সুমেরীয়রা দিয়েছেন।

''ক' অংশের অনুশীলনী

বিশেষভাবে মনে রাখবে :—

১। পারস্য উপসাগরের উত্তরে সুমের-মেসোপটামিয়ায় সৃষ্টি হয়েছিল খুব পুরানো নদী-উপত্যকা সভ্যতা (মানচিত্রে জায়গাটি দেখ)।

২। খ্রী: পূ: ৪৫০০ বছরেই সুসা এবং কিস শহরে সভ্য মানুষ ছিলেন।

৩। খ্রী: পূ: ৩৬০০ সনেই সুমেরে সুন্দর সভ্যতা সৃষ্টি হয়।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :—

(ক) প্রাচীনকালের নদীমাতৃক সভ্যতার চারটি কেন্দ্র কি কি? (খ) কোন্ নদীর সুযোগে মেসোপটামিয়ার সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল? (গ) এই সভ্যতাকে সুমের সভ্যতাও বলে কেন? (ঘ) উর শহরে মাটির নীচে কি পাওয়া গেছে? (ঙ) ইউফ্রেটিসের তীরে কয়েকটি শহরের নাম বল। (চ) সুমেরে কি কি ফসল উৎপন্ন হয়? (ছ) চাষের হাতিয়ার কি কি ছিল? (জ) কি কি পশু সুমেরীয়রা পালন করতেন?

করবার মত কাজ

সুমের অঞ্চলের একখানি মানচিত্র এঁকে বড় বড় শহরগুলির জায়গা দেখাবে।

'ক' অংশের পরীক্ষা

মোট নম্বর = ১০০ ; সময় ৩ ঘণ্টা

১। খুব সংক্ষেপে উত্তর দাও :— ৩ × ৮ = ২৪

(ক) সুমের অঞ্চলে যে খ্রী: পূ: ৬ হাজার বছরের আগেও মানুষ ছিল, তার কি প্রমাণ মিলেছে? (খ) সুমেরের রপ্তানি পণ্য কি কি ছিল? (গ)

স্থলপথে ও জলপথে তাঁরা কি কি যানবাহন ব্যবহার করতেন? (ঘ) সুমেরীয় শহরের "পবিত্র অঞ্চলে" কি করা হত? (ঙ) বন্যার ধ্বংস কাহিনীকে সুমেরের পুরোহিতরা কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন? (চ) কুনিফর্ম লিপি কি ভাবে লেখা হত? (ছ) এইসব লেখার বিষয় কি ছিল? (জ) কে এই লেখার অর্থ আবিষ্কার করেন?

২। প্রতিটির জন্য পাঁচ লাইনের মধ্যে উত্তর লেখ: ৪×৯=৩৬

(ক) ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস সুমেরীয়দের কি উপকার এবং অপকার করেছে? (খ) বন্যা সম্বন্ধে একটি সুমেরীয় প্রবাদ কাহিনী লেখ। (গ) উর শহরে মাটি খুঁড়ে বন্যার কি প্রমাণ পাওয়া গেছে? (ঘ) জিগুরাট কাকে বলতো এবং কি উদ্দেশ্যে বানানো হত? (ঙ) মানুষের বসতবাড়ী কি জিনিসে কি পরিকল্পনায় তৈরি করা হত? (চ) সুমের রাষ্ট্রের জন্য সার্গন ও নরমসীন কি করেছিলেন? (ছ) সুমেরের পুরোহিতরা কি ভাবে ঐশ্বর্যশালী এবং ক্ষমতাবান হয়েছিলেন? (জ) ধনী-দরিদ্রের বাড়ীঘরে কি রকম পার্থক্য ছিল? (ঝ) ধনীদের অট্টালিকা কিরকম ছিল?

৩। পুরো উত্তর লেখ:— ১০×৪=৪০

(ক) নান্নার মন্দিরের উল্লেখ করে সুমেরীয় মন্দিরের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের বিবরণ দাও (খ) সুমেরীয়দের ধর্ম এবং নগরদেবতার ক্ষমতা আলোচনা কর। (গ) সুমেরীয় সমাজে দাসদের কি অবস্থা ছিল? (ঘ) মানব সভ্যতায় সুমেরীয়দের দানের কথা লেখ।

(খ) নীলনদের দান—মিসর

কলকাতার জাদুঘরে একটা 'মমি' আছে। না দেখে থাকলে দেখে নিও। এই মমি আর পিরামিডের দেশ মিসরের কথা শোন।

অবস্থান: মানচিত্রে দেখ আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে রয়েছে নীলনদ। দুটি উপনদী মিলেছে নীলনদে। একটি এসেছে আবিসিনিয়ার পাহাড় থেকে বরফ গলা জল আর বৃষ্টির জল নিয়ে। আর একটি এসেছে হ্রদের জল নিয়ে। নীলনদের গতিপথে আছে কয়েকটি জলপ্রপাত। এর ফলে জলের স্রোত আরও বেড়ে গেছে।

নীলনদ : যে দেশের উপর দিয়ে নীলনদ ভূমধ্যসাগরে পড়েছে, তারই নাম মিসর। এই নদীর জল আর পলির দয়ায়

দু'পাশে চমৎকার ফসল ফলে। যেখানে জল পৌঁছে না, সেখানটা মরুভূমি।

নীলনদে প্রতি বছর ঢল নামে। ঢলের সাথে আসে পলি। জায়গাটা উর্বর হয়, চমৎকার চাষবাস হয়। **এজন্যই ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস মিসরকে বলেছেন "নীলনদের দান।"**

দয়ালু নীলের রাগও ভীষণ। বন্যাই হল নীলের রাগ। কিন্তু মিসরীয়রাও হারবার পাত্র নন। প্রাচীনকালেই সেচ খাল কেটে বাড়তি জল চাষবাসে লাগিয়েছেন। বন্যার তাণ্ডব কমিয়েছেন।

পাথর যুগের মিসর ঃ এখন যেখনে মিসর, সেখানে এক সময় ঘুরে বেড়াত যাযাবর শিকারী মানুষ। তাদের অনেক হাতিয়ার পাওয়া গেছে নীলনদের পাড়ে পাড়ে। তারপর ওখানে আসেন নূতন পাথর যুগের মানুষ। জঙ্গলের পশু, জলের কুমীর আর জলহস্তীর সাথে লড়াই করে মিসরে সভ্যতার সূচনা করেন। তাঁরা কৃষি ও ধাতুও চালু করেন, নৌকো তৈরি করেন, তাঁত বোনেন, পশুপালন করেন।

নূতন পাথর যুগে মিসরের মানুষরা অনেক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন। গোষ্ঠীকে বলা হত 'নোম'। নোমার্ক (অর্থাৎ গোষ্ঠী-পতি) নিয়মকানুন ঠিক করতেন। শাসন করতেন। ক্রমে ক্রমে গোষ্ঠীগুলো মিশে গেল। তৈরি হল উত্তর ও দক্ষিণ মিসরে দুটি রাজ্য। তারপর ধাতু যুগের সাথে সাথে সারা নীল-উপত্যকায় সৃষ্টি হল একটি রাজ্য। **কথিত আছে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মেনোস্। মেমফিস্ নগরে ছিল তাঁর রাজধানী।**

মিসর রাজ্য ঃ ঐতিহাসিকরা প্রাচীন মিসরের ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগকে বলা হয় পুরানো রাজাদের আমল (পাঁচ হাজার থেকে চার হাজার বছর আগে পর্যন্ত)। **এই সময়টাকে পিরামিডের যুগও বলে।** এই সময়ের একজন রাজা 'জোসার'-এর মন্ত্রী ইমহোটেপ বানিয়েছিলেন মিসরের সবচেয়ে পুরানো পিরামিড। প্রায় ৪৬৫০ বছর আগে রাজা খুফু বানিয়েছিলেন গিজ-এর বিশাল পিরামিড। রাজা খাপরে এবং পরবর্তী রাজাদের আমলে সাক্কারা, আবুসির এবং দেহ্সুরেও পিরামিড তৈরি

হয়েছিল। রাজা তুতেনখামেনের পিরামিড খোলা হয় ১৯২০ সনে। তখনই জানা যায় পিরামিডের অনেক রহস্য।

এই আমলের পরে কিছুদিন ছিল অরাজকতা। তারপর সুরু হয় **মধ্যবর্তী রাজাদের আমল**। তখন সব দিকেই মিসরের উন্নতি হয়। তখন নূতন রাজধানী হল থীব্স্। এরপর আবার কিছুদিন অরাজকতার পরে সৃষ্টি হয় শক্তিশালী মিসরীয় সাম্রাজ্য।

পিরামিড ঃ পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য জিনিসের মধ্যে রয়েছে পিরামিডের নাম। কিন্তু পিরামিড জিনিসটা কি ?
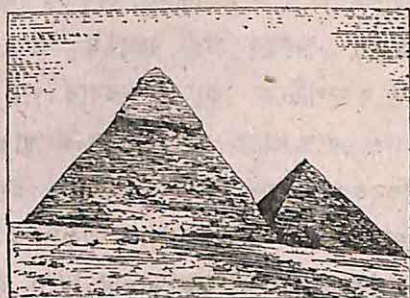
পিরামিড

পিরামিড হল নীচের দিকে চওড়া এবং ক্রমে ক্রমে উপরের দিকে সরু পাথরের সৌধ। (ছবিতে মিলিয়ে দেখ)। কোনটি তৈরি হয়েছে একটানা নীচে থেকে উপরে। কোনটি তৈরি হয়েছে ধাপে ধাপে। একে বলে ধাপ পিরামিড (স্টেপ পিরামিড)।

নীলনদের পশ্চিম পাড়ে সাক্কারায় আজও রয়েছে পাঁচ হাজার বছর আগেকার কবরখানা। জায়গাটিকে বলে "মৃতের শহর"। ঐ 'শহরের' কাছেই রয়েছে প্রায় ৪৮০০ বছর আগে তৈরি সবচেয়ে পুরানো পিরামিড—ধাপ পিরামিড। গিজের পিরামিড তৈরি হয়েছে ২৫ লক্ষ পাথর দিয়ে। এগুলির কোন কোনও খানা ১৫০ টন পর্যন্ত ভারি। ঐ পিরামিড়ে লাগানো পাথরগুলি পরপর সাজালে বিষুবরেখা বরাবর পৃথিবীর পরিধির ⅔ লম্বা হতে পারে। ৪৮১ ফুট উঁচু নিরেট পাথরের এই পিরামিড দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ লক্ষ বর্গফুট জায়গা জুড়ে। **হেরোডোটাস বলেছেন** তিন লক্ষেরও বেশী লোক কুড়ি বছরেরও বেশী সময় ধরে প্রায় ৬০০ মাইল দূর থেকেও টেনে আনা বড় বড় পাথরের চাঙড় কেটে পালিশ

করে নীচ থেকে উপরে তুলে একের পর এক পাথর জোড়া দিয়েছেন।

৩০টি বড় এবং অনেকগুলি ছোট পিরামিড আজও আছে। **কিন্তু কত শ্রমিক এবং দাস যে ঐ পাথরের তলায় প্রাণ দিয়েছে তার হিসেব কে রাখে ?**

পিরামিড তৈরির কারণ : এত পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয় করে পিরামিডগুলি বানানো হয়েছিল কেন ? তখনকার মিসরীয়রা বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক প্রাণীরই একটির মধ্যে আর একটি অদৃশ্য দেহ আছে। দেহকে তাঁরা বলতেন 'বা' এবং দেহের অদৃশ্য, ক্ষুদ্র বা দ্বিতীয় রূপটিকে 'কা'। মরবার পর বা'কে রক্ষা করতে পারলে 'কা'ও বেঁচে থাকে এবং তাহলে আত্মাও বেঁচে থাকে। তাই কা'কে অবিনশ্বর করবার জন্যই দেহটাকে রক্ষা করা হত। জীবিতকালে মানুষের প্রিয় খাদ্য, পোশাক প্রভৃতিও অদৃশ্য কা'য়ের জন্য দেওয়া হত।

মৃত্যুর পরে নাড়িভুড়ি বাদ দিয়ে রাসায়নিক আরকে ভেজানো ব্যাণ্ডেজে সারা শরীর বেঁধে কফিনের মধ্যে কফিন রেখে পিড়ামিডের গহ্বরে রাখা হত। খাদ্য, পোশাক, অলংকারও রাখা হত গহ্বরে। যে সব জিনিস সেখানে নেওয়া যেতনা, তার মডেল এবং গহ্বরের দেয়ালে সে সবের ছবি এঁকে দেওয়া হত। তারপর গহ্বরের গুপ্তপথ বন্ধ করা হত। সুতরাং **পিরামিডগুলি স্মৃতিসৌধ ছাড়া কিছুই নয়।** হাজার হাজার বছর একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে সৌধগুলি। প্রবাদ আছে, "পৃথিবীর সব কিছুই সময়ের কাছে পরাজিত হয়, কিন্তু পিরামিডের কাছে সময়ও পরাজিত হয়েছে।"

প্রাচীন মিসরীয়দের ধর্ম : মৃত্যুহীনতা সম্বন্ধে এই চিন্তা ছাড়াও ধর্ম বিশ্বাসের আরও অনেক দিক ছিল। আকাশ এবং নীলনদ ছিল মিসরীয়দের দেবতা। চাঁদও ছিল দেবতা। আমাদের দেশে চাঁদ আর রাহুর গল্পের মত তাঁরাও বিশ্বাস করতেন দানবরা চাঁদকে গ্রাস করে। রাষ্ট্রের ধর্মমতে সূর্যকে (রা) মনে করা হত শ্রেষ্ঠ দেবতা। তিনিই পৃথিবীকে উর্বর করেন, অঢেল শস্য দেন।

পশু আর গাছপালার মধ্যেও ভগবান আছেন বলে তখনকার মিসরীয়রা বিশ্বাস করতেন। ষাঁড়, কুমীর, বাজপাখী, গরু, ছাগল, ভেড়া, বিড়াল, কুকুর, শেয়াল, সাপ প্রভৃতিও ছিল ভগবানের রূপ। কা'য়ের মতই ভগবানেরও দুটি রূপ আছে বলে তাঁরা মনে করতেন। ভগবান আমনের দ্বিতীয় রূপ ভেড়া, ওসিরিস এবং রা'য়ের ষাঁড়, জ্ঞানের দেবতার দ্বিতীয় রূপ বেবুন।

ওসিরিস ছিলেন নীলনদের দেবতা। ইসিস ছিলেন মাতৃদেবী। রা, ওসিরিস, ইসিস এবং হোরাস ছিলেন দেবতাদের মধ্যে প্রধান। আরও পরে প্রধান হলেন শুধু রা এবং টা। রাজাও ছিলেন আমন রা'র পুত্র, সুতরাং দেবতা।

মন্দির স্থাপত্য : এইসব দেবতার জন্য মন্দির বানানো হয়েছিল। সেইসব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে মিসরের পুরানো শহরগুলিতে।

লুক্সর'এ ছিল সবচেয়ে সম্পদশালী রাজধানী। (এখানেই আছে পরবর্তীকালের সম্রাট দ্বিতীয় রামাসেস' এর পাথর মূর্তি। মূর্তিটি ৬০ ফুট উঁচু। এক একটি কান ৩½ ফুট লম্বা। পায়ের এক একখানা পাতা ৫ ফুট লম্বা। মূর্তিটির ওজন হবে এক হাজার টন)।

কার্ণাকের ৬০ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে পঞ্চাশ জন রাজার তৈরি অনেক মন্দির এবং আশি হাজারের বেশী মূর্তি। এখানে রয়েছে আমনের মন্দির। টায়ের মন্দির। আমাদের অজন্তা ইলোরার মত বেলে পাথরের পাহাড়ে ৬০ ফুট গর্ত করে বানানো হয়েছিল আবু-সিম্বেলের সূর্যমন্দির। কিছুদিন আগে নীলনদে আসওয়ান বাঁধ বাঁধবার সময় পৃথিবীর নানা দেশের কারিগররা নদীতীরের এই মন্দিরটিকে সরিয়ে বসালেন। মানব সভ্যতার একটি বড় সম্পদ এইভাবে রক্ষা পেল। প্রাচীন মিসরের আর একটি কীর্তি হল একটি মাত্র পাথর কেটে তৈরি সিংহের দেহ, মানুষের মাথা এবং দার্শনিকের চেহারার স্ফিংস।

মিসরের ফারাও : এতক্ষণ তোমরা বারে বারে 'রাজা' কথাটি

শুনেছ। **মিসরের রাজাকে বলা হত ফারাও।** তাঁকে মনে করা হত ভগবান। তাঁর মূর্তি রাখা হত মন্দিরে। তিনিই ছিলেন সব জমির মালিক এবং আইন-কানুনের কর্তা। ফারাওয়ের শক্তি ও গৌরবই ছিল রাজ্যের শক্তি ও গৌরব। তাঁর আহার নিদ্রা, পোশাক পরিচ্ছদ দেখাশোনার জন্য থাকত অনেক কর্মচারী এবং দাস।

পুরোহিত ঃ বুঝতেই পারছো ধর্ম আর মন্দিরের যেখানে ছড়াছড়ি সেখানে পুরোহিতের ক্ষমতাও ছিল বেশী। মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তি এবং দাস শ্রমিক ছিল তাঁদের হাতে। পুরোহিতদের খাজনা দিতে হত না, সামরিক কাজেও যেতে হত না। মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক করে এঁরা সাধারণ লোকের মনে অন্ধ বিশ্বাস এনে দিতেন। এসবের ফলেই ফারাও থেকেও এঁদের প্রতিপত্তি ছিল বেশী।

অবশ্য পুরোহিতরাও কাজ করেছেন। এঁরাই তরুণদের লেখা-পড়া শেখাতেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এঁদের অনেক দান ছিল। মন্দির-বিদ্যালয়ে প্যাপিরাসের কাগজ, কালি এবং নলখাগড়ার কলম ব্যবহার করা হত। টুকরো টুকরো কাগজ জোড়া দিলে হত বইয়ের মত। চার হাজার বছরের পুরানো পাণ্ডুলিপিও মিসরে পাওয়া গেছে। মন্দির স্কুলের ছাত্ররা 'লেখক' হিসেবে কাজ পেত।

লিপি ঃ লিপি অর্থাৎ অক্ষর না হলে লেখা হয় না। লিপির ধারনা মিসরে এসেছিল হয়তো সুমের থেকে। কিন্তু মিসরীয়রা সুমেরীয় লিপিই নকল করেননি। চিত্র লিপি থেকে তাঁরা তৈরি করেছেন ভাবলিপি (অর্থাৎ ছবির মধ্য দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করা হয়েছে)। ২৪টি চিহ্ন দিয়ে তাঁরা তৈরি করেন ব্যঞ্জন বর্ণ। এইভাবেই ৪৫০০ থেকে ৩৫০০ বছর আগে সৃষ্টি হয় মিসরের "হায়ারোগ্লিফিক" লিপি। মিসরীয় এবং ফিনিসীয় বণিকরা বাণিজ্যপণ্যের সাথে এই লিপিও নিয়েছিলেন

হায়ারোগ্লিফিক লিপি

গ্রীস ও রোমে। ফ্রান্সের পণ্ডিত স্যাঁপলিয় একখানা পাথরের লেখা থেকে মিসরের প্রাচীন ভাষার অর্থ আবিষ্কার করেন। সেই পাথরকে বলা হয় 'রসেটা পাথর'।
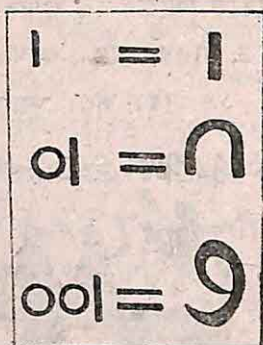
প্রাচীন মিসরের সংখ্যা

প্রাচীন মিসরীয়রা গণিত ও বিজ্ঞানেও এগিয়েছিলেন। তাঁরা নীলনদের জল মাপতে পারতেন। বন্যায় মুছে গেলে নূতন করে জমি মেপে সীমানা ঠিক করতে পারতেন। এ থেকেই হয়েছে জ্যামিতি। পিরামিড বানাতে গিয়ে আয়তন হিসেব করতে শিখেছেন। তাঁরা বর্ষপঞ্জীও বানিয়েছিলেন।

আর্থিক জীবন : কৃষি : মিসরীয় ঐশ্বর্যের পিছনে ছিল গ্রামের কৃষক এবং শহরের শ্রমিকের ধৈর্যশীল শ্রম। সাধারণ মানুষই খাল কেটেছে। পাঁচ হাজার বছর আগেই বলদ দিয়ে চাষ করেছে। পাথরের ফলা লাগানো কাস্তে ব্যবহার করেছে। পলির সদ্ব্যবহার করে প্রচুর গম, বার্লি, জোয়ার উৎপাদন করেছে। খেজুর, আপেল,

প্রাচীন মিসরের কৃষিকাজ

পীচ্ হয়েছে। ছাগল, কুকুর, গাধা, শূয়োর, হাঁসকে করেছে গৃহপালিত। নদী আর খালে মাছ হয়েছে প্রচুর।

শিল্প : কৃষকের শ্রম থেকে পাওয়া উদ্বৃত্ত ফসল গিয়েছে শহরের শিল্পী, কারিগর এবং বণিক ব্যবসায়ীর জন্য। আরব দেশ এবং নুবিয়া থেকে আনা হয়েছে ধাতু।

কারিগররা তৈরি করেছেন ব্রোঞ্জের অস্ত্র, পালিশ করা মাটির পাত্র, কাঁচের জিনিস, পাথরের পাত্র, কাঠের আসবাব। জাহাজ,

গাড়ী, কফিন তৈরি হয়েছে। কুমোরের চাকা ঘুরেছে। তাঁতে বোনা হয়েছে সিল্কের মত সুন্দর কাপড়। প্যাপিরাস ঘাস থেকে হয়েছে দড়ি, মাত্নর, জুতো, কাগজ।

২৭ মাইল লম্বা দেয়াল বানিয়ে জলাধারে জল ধরে ২৫ হাজার একর জমির উদ্ধার করেছেন প্রাচীন মিসরীয়রা। নীলনদ থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত খাল কেটেছেন।

প্রাচীন মিসরে জাহাজ-তৈরি

যানবাহন : পিরামিডের পাথর আনা হয়েছে নৌকো করে। ১০০ ফুট লম্বা জাহাজও চলতো নীলনদে, লোহিত সাগরে, ভূমধ্যসাগরে। স্থলপথে ভারবাহী ছিল মানুষ (বেশীর ভাগই দাস) এবং গাধা। ধনীদের পাল্কি-চেয়ার বয়ে নিত দাসরা।

ব্যবসা-বাণিজ্য : গ্রামের বাজারে বেচাকেনা হয়েছে **পণ্য বিনিময় করে।** বিদেশ-বাণিজ্যও হয়েছে প্রচুর। সিরিয়া, ক্রীট, সাইপ্রাস থেকে আসত ধূপ, তেল, রূপো, কাঠ। মিসর থেকে রপ্তানি হত শিল্পদ্রব্য। **ক্রমে ক্রমে সোনা রূপোর হিসেবেও দাম দেওয়া শুরু হল।** কিন্তু ফারাওকে শুল্ক দিতে হত উঁচু হারে।

খাজনা ও ট্যাক্স : কৃষকের দুর্দশা : নীলনদ যতই দান করুক, সেই দানে "ফেলাহীন" অর্থাৎ মিসরের চাষীর উপকার **হত সামান্যই।** প্রতি কৃষককেই উৎপাদনের দশভাগ খাদ্যশস্য, রুটি, মদ দিতে হত খাজনা হিসেবে। অভিজাতদের ছিল প্রচুর জমি এবং কারো কারো ১৫০০টি পর্যন্ত গরু-বলদ। এঁদের জমিতেও কৃষকের একই দশা হত। যার অল্প কিছু জমি থাকত, সেই "স্বাধীন" কৃষকের উপর চেপে বসতো দালাল এবং ট্যাক্স আদায়কারীরা। **শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত নিংড়ে নেওয়াই ছিল ট্যাক্স আদায়কারীর কাজ।**

মিসরের প্রাচীন "লেখকের" (স্ক্রাইব) বিবরণে আছে কৃষকের দুর্দশা এবং ট্যাক্স আদায়কারীর জুলুমের কথা। "কৃষকের উৎপাদনের ১/১০ চলে যায় খাজনা দিতে। একটা অংশ খেয়ে নেয় পোকা, জল-হাতী, ইঁদুর, ফড়িং, পাখী, গরুবলদে। যা রইল তারও এক অংশ ছিনিয়ে নেয় চোর ডাকাতরা। তারপর "লেখক" নেয় দশ ভাগ। সব শেষে হাতে মুগুর নিয়ে আসে রাজার শস্য ভাণ্ডারী এবং ট্যাক্স আদায়কারী। চাহিদামত দিতে না পারলে কৃষককে মাটিতে ফেলে বাঁধা হয়। টেনে হিঁচড়ে কাছাকাছি খালের জলে ছুড়ে ফেলা হয়। তার স্ত্রী এবং সন্তানদেরও তার সাথেই বেঁধে দেওয়া হয়। প্রতিবেশীরা কি করবে? তারা তো আত্মরক্ষার জন্য নিজেরাই ইতিমধ্যে পালিয়েছে।"

এখানেই কিন্তু মিটল না। খাজনার কর্তা আবারও চড়াও হলেন। **চাষীকে বিনা মজুরিতে বেগার খাটতে হয়** রাস্তা তৈরি, খালের তলানি বালি তোলা, রাজার জমি চাষ করা, পিরামিড মন্দির রাজপ্রাসাদের জন্য পাথর বহনের কাজে।

শ্রমিকের জীবন : কৃষক ছাড়া অন্য শ্রমজীবীদের মধ্যে কিছু ছিল "স্বাধীন" মানুষ। অবশ্য বহু সংখ্যক দাসও ছিল।

শ্রমিকদের অনেকেই বংশ পরম্পরায় কারিগরির কাজ করত। মজুর খেটে যারা বাঁচত, তাদের থাকতে হত সর্দারের অধীনে। সর্দাররাই দলে দলে মজুর লাগাতো। মাইনে দিত যৎসামান্য। কাজে না এলে মজুরি কাটা হত। এদের খাটতে হত সৈন্যবাহিনীর মত দল বেঁধে, নিয়ম মাফিক।

দাস শ্রমিকরা দেনার দায়ে, নয়তো যুদ্ধ-বন্দীত্বের ফলে দাস হয়েছে। আশে-পাশের লোকালয় থেকে স্বাধীন মানুষকেও ধরে এনে দাস বানানো হত। নীলামে দাস বিক্রি হত। বেশীর ভাগ দাসেরই মালিক ছিলেন ফারাও নিজে। মন্দিরগুলিরও ছিল বহু দাস। স্ত্রী-**পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ যাই হোক, এদের ভাগ্যে ছিল শুধুই শ্রম।** পরনে কাপড় নেই। রোগেও বিশ্রাম নেই। জীবন থেকে মৃত্যুই ছিল বেশী কাম্য। দাসত্বের মধ্যেই এদের মৃত্যু হত।

লেখক-করণিক ঃ আজ আমরা দেখি করণিকরা (কেরানী) খাতায় পত্রে বিবরণ লেখেন, হিসাব পত্র লেখেন, চিঠি লেখেন। প্রাচীন মিসরেও কিন্তু লেখক-করণিক ছিলেন।

পুরোহিতরা তৈরি করতেন লেখক, হিসেব রক্ষক। তাঁরা মন্দিরের সম্পত্তি, আয়-ব্যয়, শ্রমিক-মজুরের হিসেব রাখতেন। কাজ করতেন বণিকদের ব্যবসায়ের হিসেব রাখবার জন্য। কাজ করতেন ফারাওয়েরও অর্থাৎ এঁরা ছিলের আমলা-কেরানী।

লেখকদের পোশাক পরিচ্ছদের তেমন বালাই ছিল না। অনেকে প্রায় নেংটি পরেই থাকতেন। হাতে থাকত কলম। কানে গোঁজা থাকত একটা বাড়তি কলম। কতটা কাজ হল, কত মালপত্র এল-গেল, কত দাম দেওয়া হল, কি খরচ পড়ল, লাভ-লোকসান কত হল এই সব হিসেব রাখতেন। কসাইখানায় পশু পাঠানোর সময় গুণতি করে দিতেন। শস্য বিক্রির সময় কত বস্তা ওজন হল সেই হিসেব রাখতেন। প্রভুর আয়-ব্যয়, সরকারী তহবিলে তাঁর দেয় ট্যাক্স-খাজনারও হিসেব রাখতেন।

সরকারী কাজে নিযুক্ত 'লেখকরা' প্রজাদের আয় এবং সেই আয়ের কত অংশ সরকারী তহবিলে দিতে হবে—সেই হিসেব রাখতেন। জমিতে জলসেচের পরিমাণ হিসেব করে কোন জমিতে কত ফসল হবে এবং সরকারী ভাগে কত ফসল পাওয়া যাবে সে খবর আগেই বলতেন। শিল্প বাণিজ্যের উপর লক্ষ্য রাখতেন। **ট্যাক্স আদায়কারীর উপর যেমন ফারাওকে নির্ভর করতে হত, তেমনি লেখকের উপরও নির্ভর করতে হত।** লেখকরা এই একঘেয়ে পরিশ্রমের কাজও মনোযোগ দিয়ে, ঘড়ির কাঁটার মত নির্দিষ্ট ভাবেই করতেন। কিন্তু মানুষের দুঃখ কি তাঁদের মনকে নাড়া দিত না? সেই মনের কথাই তাঁরা লিখে রাখতেন অবসর সময়ে।

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে :—

নীলনদের অববাহিকায় পুরানো পাথর, নয়া পাথর এবং ব্রোঞ্জ সভ্যতার চিহ্ন মিলেছে।

মিসর সভ্যতার যুগ বিভাগ :—

খ্রীঃ পূঃ ৩৫০০ থেকে ২৬৩১ পুরানো রাজাদের যুগ। (এর মধ্যে খ্রীঃ পূঃ ৩১০০ থেকে ২৯৬৫ সন ছিল পিরামিডের যুগ—যখন খুফু, খাপরে প্রভৃতি পিরামিড বানিয়েছেন)। খ্রীঃ পূঃ ২৩৭৫ থেকে খ্রীঃ পূঃ ১৮০০ সন মধ্যবর্তী রাজাদের যুগ। খ্রীঃ পূঃ ১৫৮০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ১১০০ সন সাম্রাজ্যের যুগ।

করবার মত কাজ

মিসরের একখানি মানচিত্র আঁকবে।

'খ' অংশ থেকে পরীক্ষা

মোট নম্বর = ১০০, সময় ৩ ঘণ্টা

১। **মুখে মুখে উত্তর দাও :** ১ × ৮ = ৮

(ক) মিসর দেশটি কোথায় ? (খ) কোন দুটি নদীর জলে নীল নদ পরিপুষ্ট হয় ? (গ) মিসরে আবিষ্কৃত পুরানো পাথর যুগের হাতিয়ার থেকে কি বোঝা যায় ? (ঘ) পিরামিডের যুগ বলতে কোন সময়টি বোঝায় ? (ঙ) সবচেয়ে পুরানো পিরামিডটি কে বানিয়েছিলেন ? (চ) এখনও মিসরে কয়টি পিরামিড আছে ? (ছ) মিসরীয়রা কেন পিরামিড বানিয়েছিলেন ? (জ) স্ফিংস জিনিসটি কী ?

২। মাত্র পাঁচ লাইনে উত্তর লেখ :— ২ × ১০ = ২০

(ক) হেরোডোটাস মিসরকে নীলনদের দান বলেছিলেন কেন ? (খ) শান্ত নীলের রাগ বলতে কি বোঝায় ? (গ) নূতন পাথর যুগের মানুষেরা কিভাবে মিশরকে বাসযোগ্য করেছিলেন ? (ঘ) কার চেষ্টায় মিসরে ঐক্যবদ্ধ রাজ্য হয় ? কোথায় হয় তাঁর রাজধানী ? (ঙ) পিরামিড জিনিসটি কী ? (চ) মৃতের শহর বলতে কি বুঝায় ? (ছ) মমি কাকে বলে এবং কি ভাবে তৈরি করা হত ? (জ) হায়ারোগ্লিফিক লিপির উদ্ভব কিভাবে হয় ? (ঝ) জ্যামিতি কি ভাবে সৃষ্টি হল ? (ঞ) প্যাপিরাস থেকে মিসরীয়রা কি কি জিনিস বানাতেন ?

৩। **সংক্ষেপে উত্তর দাও :—** ৪ × ৯ = ৩৬

(ক) পুরানো রাজাদের কয়েকটি নাম এবং তাদের কাজের কথা লেখ। (খ) "কা" সম্বন্ধে মিসরীয়দের কী ধারণা ছিল ? (গ) ফারাওয়ের ক্ষমতার কথা সংক্ষেপে লেখ। (ঘ) মিসরীয়দের কৃষিকাজের বিবরণ দাও। (ঙ) মিসরের প্রধান প্রধান শিল্পদ্রব্য কী ছিল ? (চ) কারিগরি বিদ্যায় মিসরীয়দের সাফল্য

উল্লেখ কর। (ছ) প্রাচীন মিসরে যানবাহন এবং বিদেশ বাণিজ্য কিরকম ছিল? (জ) লুক্সর, কার্নাক, আবু সিম্বেলের মন্দিরগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (ঝ) গিজের পিরামিড সম্বন্ধে হেরোডোটাস এবং অন্যান্যদের মন্তব্য উল্লেখ কর।

৪। পুরো উত্তর লেখ :— ৮×৪=৩২

(ক) আমন, বা, রা, কা, টা প্রভৃতির উল্লেখ করে প্রাচীন মিসরের ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে লেখ। পুরোহিতরা কিভাবে সম্পদশালী হয়েছিলেন? (খ) মিসরের কৃষকের অবস্থা এবং ট্যাক্সের জুলুম সম্বন্ধে একটি বিবরণী লেখ। (গ) দাসদের অবস্থা কিরকম ছিল? (ঘ) "লেখকের" শিক্ষা, জীবন ও কাজের একটি বিবরণ লেখ।

পরিচ্ছন্নতার জন্য = ৪

(গ) সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার

এবার শোন আমাদের দেশ—ভারতের কথা।

ভারতেও অনেক পুরানো দিনের মানুষের কংকাল এবং পুরানো এবং নূতর পাথর যুগের জিনিস পাওয়া গেছে। তবে সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হয়েছে সিন্ধু নদের অঞ্চলে।

অবস্থান : মানচিত্রে দেখ ভারত উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম কোণে রয়েছে সিন্ধুনদ এবং তার পাঁচটি উপনদী। একশ বছরের

বেশী আগে সিন্ধু অঞ্চলে রেল লাইন তৈরির সময় এক জায়গায় চোখ পড়ল একটা মস্ত বড় ঢিবি। অনেকদিন পরে ১৯২১-২২ সনে প্রত্নতাত্ত্বিকরা ওখানকার মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করলেন সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারো এবং ৫০০ মাইল উত্তরে পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলায় হরপ্পাতে খুব পুরানো সভ্যতার নানা রকম চিহ্ন, বিশেষত তামা যুগের শহর। কিন্তু শহর তৈরির আগেও ওখানে কৃষিজীবী মানুষ ছিলেন। সেই প্রমাণও আছে। এইসব আবিষ্কারের কৃতিত্ব ছিল জন মার্সাল, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, ননীগোপাল মজুমদার প্রভৃতির। প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার জন মার্সাল সারা দুনিয়াকে জানালেন মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পাতেও এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরানো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। (কিন্তু দুটি জায়গাই এখন পাকিস্তানে)।

জায়গার বিশেষত্ব : মাত্র দুটি জায়গাতেই নয়। বেলুচিস্তান, মকরাণ, কাথিয়াবাড়, রাজস্থানের কলিবংগান, গুজরাটের লোথাল, পাঞ্জাবের রূপার, উত্তর প্রদেশের এক অংশে, মোট ৭০টি জায়গায় ৫ লক্ষ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে একই রকম সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেল। শুধু সিন্ধু পাড়েই আবদ্ধ ছিল না বলে সভ্যতার বিশেষ চেহারা অনুসারে একে এখন হরপ্পা সভ্যতা অথবা হরপ্পা সংস্কৃতিও বলে।

*** ঐ জায়গাতেই এই সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল কেন ? ***

যে জায়গায় চিহ্নগুলি পাওয়া গেছে তার পূর্বদিকে ছিল সরস্বতী নদী (এখন অবশ্য এই নদীটি শুকিয়ে গেছে)। আর পশ্চিম দিকে সিন্ধুনদ এবং তার পাঁচটি উপনদী। এইসব নদীর জলেই এখানে চাষবাসের সুবিধে হয়েছে। নদীপথে যাতায়াত এবং বাণিজ্যও হতে পেরেছে। সুমের, মিসর এবং অন্যান্য জায়গার সাথে সমুদ্রপথেও বাণিজ্য হতে পেরেছে। এই সব কারণেই মানুষ এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এক সুন্দর সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

মাটির নীচে শহর : মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার মাটির নীচে পাওয়া গেছে বাড়ীঘরে ভর্তি পুরো শহর। শহরের অধিবাসীও ছিলেন অনেক।

একদিক থেকে আর এক দিক পর্যন্ত শহরের মধ্য দিয়ে ছিল চওড়া রাস্তা। মহেঞ্জোদারোর একটি প্রধান রাস্তা ছিল ৮০০ মিটার লম্বা, ১০ মিটার চওড়া। রাস্তার দু'ধারে ছিল পোড়া ইটের বাড়ী—কোন কোনটি একতলা বস্তিবাড়ীর মত, কোন কোনটি কয়েক তলা বড় বাড়ী। রাস্তার পাশে ছিল দোকান। বড় রাস্তা থেকে বেরিয়েছিল সরু সরু গলি। সাধারণের জন্য কুয়োও ছিল। প্রত্যেকটি বাড়ীতে ছিল স্নানের ঘর। বাড়ীর নর্দমা দিয়ে জল এসে রাস্তার পাশে সাধারণ নর্দমায় পড়ত। বাড়ীগুলিতে আলাদা শোবার ঘরও ছিল।

প্রতিটি শহরেই একটা সুরক্ষিত জায়গা ছিল। এখানে থাকত নাগরিকদের সভা সমিতির অথবা ধর্মানুষ্ঠানের জায়গা। হরপ্পাতে এই ধরনের জায়গায় এমন একটি বড় বাড়ী পাওয়া গেছে যাকে শস্যভাণ্ডার বলে মনে হয়। শহরবাসীর বাড়ীঘরের জায়গাও ঠিক করা ছিল। সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটা ঘাট বাঁধানো বড় পুকুর পাওয়া গেছে। অনুমান করা হয় এখন যেমন পূজো-পার্বণে অনেকে স্নান করেন, হয়তো ওখানেও তেমনি ধর্মীয় উৎসবের সময় সকলে স্নান করতেন। সহজেই বলা যায় যে হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীরা এক সুন্দর নগর সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন।

আবিষ্কৃত অন্যান্য জিনিস : শহরগুলির এখানে ওখানে পাওয়া গেছে মাটি, তামা, ব্রোঞ্জের তৈরি গৃহস্থালির বাসনপত্র। ধনীরা হয়তো রূপোর বাসনও ব্যবহার করেছেন। স্নান ও সাজগোছের জিনিস, সাদাসিধে কিম্বা নক্সা করা মাটির বাসন, টেরাকোটা শিল্প চাকা, পাশা-দাবার ঘুঁটি, মুদ্রা, চিত্র-ভাষা, খোদাই করা পাথরের জিনিস, তামার অস্ত্রশস্ত্র এবং কারিগরির যন্ত্রপাতিও পাওয়া গেছে। কুড়ুল, বর্শা, ছুরি, গদা ছিল অস্ত্র। দু' চাকার গাড়ী, সুন্দরভাবে পালিশ করা রূপোর বালা, কানের দুল, গলার হারও পাওয়া গেছে।

মাটির সবচেয়ে নীচু স্তরে পাওয়া জিনিসগুলি ছিল সবচেয়ে সুন্দর। মনে হয় অধিবাসীদের শিল্প প্রতিভা যেন ক্রমে ক্রমে

কমে গিয়েছিল। গভীর স্তরে পাওয়া গেছে পাথরের জিনিস। তামা ও ব্রোঞ্জের জিনিসও।

আবিষ্কৃত জিনিস থেকে প্রমাণ হয় খ্রীষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগে ঐ অঞ্চলে নগর সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। এখানকার আর্থিক অবস্থা অন্ততঃ সুমেরের মত ছিল। তখনকার ব্যাবিলন এবং মিসরের চেয়ে হয়তো উন্নত ছিল। এখানকার বাড়ীগুলি সম্ভবতঃ মেসোপটামিয়ার উর শহরের বাড়ীঘরের চেয়ে ভাল ছিল।

চাষবাস ঃ কিন্তু শহর থাকলেই তো হল না। শহরের লোক-জনের তো খাদ্য লাগত। কোথা থেকে আসত সেই খাদ্য?

কৃষকের গ্রামের চিহ্ন না থাকলেও এই সভ্যতাকে যাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তাঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন কৃষক, একথা সহজেই বোঝা যায়। তাঁরা থাকতেন নগর দেয়ালের বাইরে, যেখানে ছিল চাষের জমি। গ্রামের উদ্বৃত্ত শস্য নিয়েই শহর বাঁচতো।

কৃষকরা উৎপাদন করতেন গম, বার্লি, খেজুর। এগুলিই ছিল প্রধান খাদ্য। (গম, যব, খেজুর পাওয়া গেছে)। তাঁরা গরু-বলদ, ছাগল, মোষ পালন করতেন। (ভেড়া কিম্বা ঘোড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি)। মাছ, মাংস, ডিম খেতেন। চাষীরা তুলো ফলাতেন। হয়তো এখান থেকে তুলো যেত মেসোপটামিয়ায়। আজকের মতই তাঁরা বলদ, মোষ, কুকুর, উটকে দিয়ে কাজ করিয়েছেন।

কারিগরদের শিল্পকাজ ঃ চাকা ঘুরিয়ে মাটির জিনিস তৈরি করতে পারা কারিগরি দক্ষতার চিহ্ন। হরপ্পা সভ্যতা যুগের কুমোররা সেই রকম দক্ষ ছিলেন। লাল-কালো রংয়ের নক্সা আঁকা সরু গলার বড় বড় বয়ম পাওয়া গেছে। নানা ধরনের মাটির পুতুল এবং খেলনাও তাঁরা বানাতেন। খেলনা গাড়ীর চাকা, জোয়াল কাঁধে পশু, খেলনা পাখীও পাওয়া গেছে।

নক্সা আঁকা পাত্র

আরও মনে রেখ হরপ্পা সভ্যতার মানুষরা

ধাতুর বাসনপত্র এবং হাতিয়ারও বানিয়েছেন। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গেছে ব্রোঞ্জের তৈরি খুব সুন্দর কারুকাজের নর্তকী মূর্তি। হরপ্পায় পাওয়া গেছে সূক্ষ্ম পিন-এর উপর সোনার তৈরি একটা বাঁদরের মূর্তি। সুচ, চিরুনি, কাস্তে, বাটালিও ওরা ব্যবহার করেছেন। মোট কথা কামার, কুমোর, তাঁতী, ছুতোর প্রভৃতি কারিগররা বেশ ওস্তাদ ছিলেন।

নারীমূর্তি

সীলমোহর : হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর সীলমোহরগুলি দেখলে অবাক হতে হয়। আকারে ছোট, চ্যাপ্টা, চৌকো এবং আয়তাকার সীলমোহর পাওয়া গেছে দু' হাজারের বেশী। এগুলিতে রয়েছে দানবের মত মূর্তির ছাপ, জন্তুর ছাপ, কোনটিতে লেখার ছাপ। কোনটা হয়তো দেবমূর্তির ছাপ।

সীলমোহগুলির সুন্দর এবং এর লেখাগুলি পরিষ্কার। কিন্তু এখনও লেখাগুলির অর্থ বার করা সম্ভব হয়নি। সে জন্যই সিন্ধু-সভ্যতা সম্বন্ধে সবকিছু আমরা এখনও জানিনা।

ব্যবসা-বাণিজ্য : চাষবাস এবং কারিগরি ছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যও ছিল সিন্ধুবাসীদের আয়ের পথ। বিদেশ বাণিজ্য হত মেসোপটামিয়া অঞ্চলের সাথেই বেশী। এখান থেকে চালান যেত সুন্দর সুন্দর মাটির জিনিস, শস্য, তুলো এবং তুলোর পোশাক, মসলা, পাথরের পুঁতি, মুক্তো, কাজল-সুরমা। ধাতুর তৈরি জিনিসই বিদেশ থেকে আনা হত বেশী। আমদানি-রপ্তানি এবং দেনা-পাওনা ছিল বলেই হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর সীলমোহর পাওয়া গেছে কিস্ শহরে। সিন্ধু-অঞ্চলে নাগদেবতার পূজো হত। মেসোপটামিয়ার সীলমোহরেও পাওয়া গেছে নাগমূর্তি।

সিন্ধুবাসীদের ধর্ম : হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর মানুষ কি রকম ধর্মে বিশ্বাস করতেন, সে কথা আমরা এখনও পুরোপুরি বলতে পারি না। তাঁদের লেখাগুলির অর্থ বুঝতে না পারাতেই হয়েছে মুস্কিল। তবু সেখানে পাওয়া জিনিসগুলি থেকে আমরা ধারণা করতে পারি।

একটা সীলমোহরে এমন মূর্তির ছাপ রয়েছে যাঁর তিন মাথা এবং মাথায় শিং আছে। তিনি যেন যোগীর মত ধ্যানে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে হাতী, বাঘ, ষাঁড়, গণ্ডার এবং ছাগল। এই মূর্তিকে অনেকে পশুপতি শিবের মূর্তির সাথে তুলনা করেন। শিবলিঙ্গের মত পাথরও পাওয়া গেছে। এখানেও ছিল মাতৃ-পূজা। মৃতদেহ কখনো কবর দেওয়া হত, কখনো হয়তো পোড়ানোও হত।

মহেঞ্জোদারো বৃষ

হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর সমাজ : রাজপ্রাসাদ বলে সহজেই চেনা যায় এমন কিছু এখানে পাওয়া যায়নি। কোন রাজবংশের কথাও জানা যায়নি। রাজা থাকুন কিম্বা না থাকুন এখানকার অভিজাতরা যে খুব প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাবান ছিলেন একথা বোঝা যায়। সাধারণ মানুষের সাথে অভিজাতদের পার্থক্যও ছিল খুব বেশী।

বেশীর ভাগ লোকই ছিলেন চাষী এবং পশুপালক। এঁরা শহরের বাইরে বাস করলেও এঁদের উপরই ছিল শহরের নির্ভর।

শহরে কারিগরদের মধ্যে কুমোর, তাঁতী, ধাতুশিল্পী, ছুতোর মিস্ত্রী, ইট পাথরের বাড়ী তৈরির মিস্ত্রী, পৌরকর্মী, পরিবহন কর্মীর পরিচয় রয়েছে তাঁদের কাজের মধ্যেই। চাকাওয়ালা গাড়ীর মডেল পাওয়া গেছে। লোথাল' এ পাওয়া গেছে জাহাজ ঘাটার চিহ্ন।

বণিকও ছিলেন অনেক। এঁদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই ভাল। ধর্মানুষ্ঠানের আভাস থেকেই বোঝা যায় এখানেও ছিলেন পুরোহিত। সীলমোহর থেকে বোঝা যায় লেখার প্রচলন হয়েছিল। হয়তো সুমের মিসরের মত "লেখকও" ছিলেন।

গরীব বড়লোকের প্রভেদ ছিল খুবই বেশী। ধনীদের নেকলেস্, বালা, অন্যান্য সাজসজ্জা এবং বড় বড় বাড়ী থেকে বোঝা যায় তাঁদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল। পাশা এবং দাবা খেলে তাঁরা অবসর সময় কাটাতেন। তাঁদের ছেলেমেদেরও ছিল নানা রকম খেলনা।
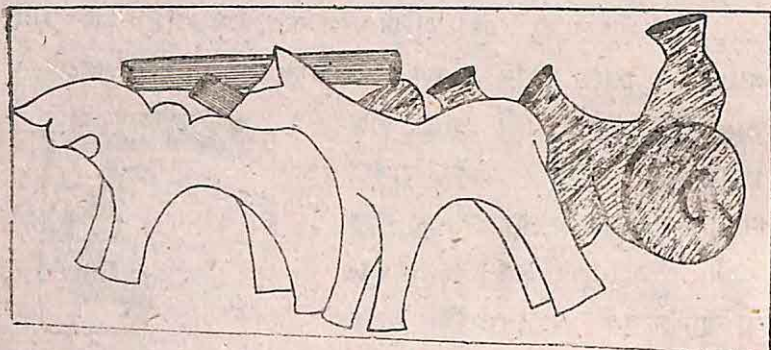
চাকাওয়ালা গাড়ীর টেরাকোটা মডেল

শহরের মজুর কারিগররা যে বেশ গরীব ছিলেন সেকথা বোঝা যায় তাঁদের বস্তি বাড়ীর অবস্থা থেকে। সুমের, মিসরে দাস ব্যবস্থা যতটা ভীষণভাবে ছিল, তেমন প্রমাণ সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রায় একই সময়ের হরপ্পা সভ্যতায় যে একেবারেই ছিলনা, এমনও বলা মুস্কিল।

সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংস : আগে থেকে সুরু হলেও খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ সন থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ সন পর্যন্ত **এক হাজার বছর ছিল সিন্ধু-সভ্যতার গৌরবের সময়।** রেডিও কার্বন পরীক্ষা করে এখানকার অনেক জিনিসেরই বয়স ঠিক হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ২৩০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫০ বছরের মধ্যে। তারপর থেকেই এই সভ্যতার অবনতি হতে থাকে। এই অবস্থায় ইরান থেকে দলে দলে আর্যরা ভারতে ঢোকেন। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ সন নাগাদ সিন্ধু সভ্যতা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে।

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে :—

যে সব জায়গায় বহু প্রাচীন কালেই সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে আমাদের ভারতও ছিল। এখানেই পাওয়া গেছে বিস্ময়ের জিনিস—**মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পার শহর।**

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :—

(ক) মহেঞ্জোদারো জায়গাটি কোথায় ? (খ) হরপ্পা জায়গাটি কোথায় ? (গ) সিন্ধু সভ্যতা কখন আবিষ্কৃত হয়েছে ? (ঘ) এই আবিষ্কারের গৌরব কার কার প্রাপ্য ?

করবার মত কাজ

একখানি মানচিত্র এঁকে যে সব জায়গায় হরপ্পা সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে, সেই জায়গাগুলি দেখাবে।

"গ" অংশ থেকে পরীক্ষা

মোট নম্বর ১০০ ; সময় ২ ঘণ্টা

১। এক লাইনে উত্তর দাও :— ২ × ৫ = ১০

(ক) সিন্ধু সভ্যতা কতদিন আগে সৃষ্টি হয়েছিল ? (খ) সিন্ধু নদের অববাহিকাতে সভ্যতার কি সুযোগ ছিল ? (গ) মাটির নীচে কতগুলো সীলমোহর পাওয়া গেছে ? (ঘ) সাধারণের পুকুরটি কি কাজে লাগতো বলে মনে হয় ? (ঙ) নগরের সুরক্ষিত জায়গায় কি কাজ হত ?

২। প্রতিটির উত্তর পাঁচ লাইন করে লেখ :— ৫ × ৯ = ৪৫

(ক) মহেঞ্জোদারো হরপ্পার সভ্যতার মত চিহ্ন পশ্চিম ভারতের আর কোথায় পাওয়া গেছে ? (খ) সিন্ধু সভ্যতার বদলে এখন "হরপ্পা সংস্কৃতি" বলা হয় কেন ? (গ) মহেঞ্জোদারোর রাস্তাগুলি কেমন ছিল ? (ঘ) কি কি ধরনের বাড়ী ছিল ? (ঙ) ওখানকার অধিবাসীদের স্বাস্থ্যচেতনার কি পরিচয় পাওয়া গেছে ? (চ) হরপ্পা মহেঞ্জোদারোতে শিল্পকলার যে ক্রমে ক্রমে অবনতি হয়েছিল একথা কি ভাবে ধারণা করা চলে ? (ছ) হরপ্পা সভ্যতার চিহ্ন থেকে সেই সময় কৃষি উৎপাদন এবং মানুষের খাদ্য সম্বন্ধে কি প্রমাণ পাওয়া গেছে ? (জ) কোন কোন জন্তু পোষ মানিয়ে ওখানে কাজ করানো হয়েছে ? (ঝ) নগর সভ্যতা হলেও নগরগুলি যে কৃষির উপর অনেকটা নির্ভর করত, একথা কি করে বোঝা যায় ?

৩। পুরো উত্তর লেখ :— ৫ × ৯ = ৪৫

(ক) মহেঞ্জোদারো হরপ্পার আবিষ্কৃত বিভিন্ন ধরনের জিনিসের একটি তালিকা দাও। (খ) হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর শিল্পী কারিগররা কি ধরনের শিল্পকাজ এবং সখের জিনিস বানাতেন ? (গ) কোথায় কোথায় হরপ্পা

মহেঞ্জোদারোর ব্যবসা বাণিজ্য চলত ? (ঘ) হরপ্পা সভ্যতায় মানুষের ধর্ম বিশ্বাস কি ধরনের ছিল ? (ঙ) হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মী এবং ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য সম্বন্ধে একটি বিবরণ লেখ।

(ঘ) হোয়াংহো—ইয়াংসিকিয়াংয়ের সভ্যতা

এবার শোন চীন দেশের অনেক পুরানো দিনের কথা।

প্রাচীনতা : পিকিং শহর থেকে ২৬ মাইল দূরে চৌ কৌ তিয়েন গ্রামে পাওয়া গেছে মানুষের মাথার খুলি, এবড়ো থেবড়ো কিছু পাথরের হাতিয়ার আর আগুনে পোড়া জিনিসের ছাই, একথা তো আগেই শুনেছ। নিশ্চয় ওখানে লক্ষ লক্ষ বছর আগেও "মানুষ" চলাফেরা করত। মিঃ এ্যানড্রুজ নামের এক গবেষক দেখিয়েছেন খ্রীষ্ট জন্মের কুড়ি হাজার বছর আগেও মঙ্গোলিয়ায় মানুষ ছিল।

হোয়াংহো এবং ইয়াংসিকিয়াংয়ের অববাহিকায় প্রাচীন চীনের সভ্যতা

নূতন পাথর যুগের জিনিস পাওয়া গেছে হোনান এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায়। অবশ্য এইসব জিনিসের বয়স সুমের মিসরে পাওয়া ঐ ধরনের জিনিসের বয়স থেকে এক হাজার বছর কম। অর্থাৎ এখানকার সভ্যতার সূচনা হয়েছে একটু পরে।

অবস্থান : পশ্চিমের পাহাড় থেকে নেমে চীনের দুটি বড় বড় নদী পুবের সমভূমি দিয়ে বয়ে গেছে সমুদ্রের দিকে। দুটির মধ্যে উত্তরের নদীটি হোয়াংহো। এই নদীকে পীত নদীও বলে। এই নদীর স্রোতে পলির সাথে বয়ে আসে বালি-কাঁকরের তলানি। দক্ষিণের নদীটি ইয়াং-সি-কিয়াং। (মানচিত্রে হোয়াংহো, ইয়াং-সি-কিয়াং নদী-উপত্যকা দেখে নাও)।

পশ্চিম চীনের মরুভূমি আর পাহাড়ে প্রাচীন কালে চাষবাস হতে পারেনি। সমুদ্রপাড়ে এবং সমতলের নদী উপত্যকাতেই চাষবাস হয়েছে প্রচুর। জঙ্গলের হিংস্র পশু, খরা, বন্যার সাথে লড়াই করে মানুষ চাষের জমি আবাদ করেছে। খাল কেটে জল নিয়েছে।

বন্যার বিরুদ্ধে লড়াই : হোয়াংহো অঞ্চলে নদীর জল এবং পলি পাওয়াতে সেখানেই চীনের সভ্যতা প্রথমে গড়ে উঠল। কিন্তু হোয়াংহোর ভীষণ বন্যায় মানুষের বাড়ীঘর এবং ফসলের ক্ষেত নষ্ট হত বলে ঐ নদীকে বলা হত "চীনের দুঃখ"। নদীর খামখেয়ালির বিরুদ্ধে লড়াই করেই চীনের লোক সভ্য হতে লাগলেন। সেই যুগে **যে সব দেশ বন্যার ধ্বংস কমাতে পেরেছে, তারাই সৃষ্টি করেছে সভ্যতা। যে মানুষ বন্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতা হয়ে জয়লাভ করেছেন, তিনিই সকলের কাছে দেবতার মত হয়েছেন।**

রূপকথা ও লোকপ্রবাদ : অনেক পুরানো কাল থেকেই চীনে মানুষের বাস ছিল বলে শত শত বছর ধরে তৈরি হয়েছে অনেক রূপকথা ও লোককাহিনী। কাহিনীগুলি বিশ্বাস না করলেও ঐ বিবরণ থেকে পুরানো চীন সম্বন্ধে আমরা কিছু আন্দাজ করতে পারি।

একটি লোক কাহিনী শোন। "লক্ষ লক্ষ বছর আগে প্রথম মানুষ পানকু ১৮ হাজার বছরের পরিশ্রমে এই ব্রহ্মাণ্ডকে গড়ে পিটে তৈরি করেন। খাটুনির সময় তাঁর নিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হয়েছে বাতাস এবং মেঘ, কণ্ঠস্বর থেকে বজ্রের শব্দ। তাঁর শিরা উপশিরাই হল নদ নদী, মাংস হল মাটি, চুল হল গাছপালা, হাড় থেকে হল ধাতু, ঘাম থেকে বৃষ্টি, তার গায়ের উকুন থেকেই হল মানুষ।"

খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৫৬ সন থেকে চীনের অনেক রাজার কথা ইতিহাসে মোটামুটি জানা যায়। কিন্তু প্রবাদ আছে যে তাঁদেরও অনেক আগে অনেক রাজা প্রত্যেকে ১৮ হাজার বছর রাজত্ব করেন। যে মানুষ ছিল পশুর মত, যারা কাঁচা মাংস খেত, সেই মানুষকে অর্থাৎ পানকুর উকুনকে ঐ রাজারা "মানুষ" করে গেলেন। বন্যা সম্বন্ধেও চীনে অনেক প্রবাদ এবং লোক কাহিনী ছিল। মহাপ্লাবন হল। সব কিছু ভেসে গেল। ভগবানের ইচ্ছায় চীনাদের পূর্বপুরুষ কোন রকমে আত্মরক্ষা করলেন। তারপর আবার একে একে সব কিছু সৃষ্টি হল।

ধর্মের কথা : চীনের মানুষও প্রাচীনকালে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকেই ভগবান বলে মনে করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন দেবতারা উপর থেকে ভক্তদের মঙ্গল করেন। কি করতে হবে এবং কি করা ঠিক নয়—একথাও দেবতারা বলে দেন। এই বিশ্বাসের ফলের দৈববাণীর খুব দাম ছিল।

পুরোহিতের মুখ দিয়েই দৈববাণী হত। পালিশ করা কচ্ছপের খোলা কিম্বা গরু বলদের হাড়ে নক্সার মত করে ফুটো করা হত। ভগবানের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করে ব্রোঞ্জের একটা গরম হাতিয়ার সেই হাড় কিম্বা কচ্ছপের খোলায় লাগানো হত। খোলাটি ফাটতো। ফাটল অনুযায়ী প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যা করা হত। ঐ ব্যাখ্যাই হল দৈববাণী। সকলের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দৈববাণী অনেক সময় হাড়ের উপর খোদাই করা হত। এভাবেই সৃষ্টি হয় চীনের লিপি।

যে মাটি খাদ্য যোগায়, সেই মাটিকে চীনের মানুষ খুবই শ্রদ্ধা করতেন। জন্ম হওয়ামাত্র শিশুকে মাটিতে শোয়ানো হত। মৃত-ব্যক্তিকেও মাটিতে শোয়ানো হত।

লিপি : চীনের লিপিও বেশ পুরানো। এই লিপিও সুরু হয় চিত্র-ভাষা থেকেই। এক একটি ছবিতে মনের এক একটি ভাব প্রকাশ করা হয়। চিত্র-ভাষার ফলে লেখার কাজ হয় শিল্পকলার মত। বাঁশের চটা, কচ্ছপের মসৃণ খোলার উপর প্রথম লেখা হত। ক্রমে ক্রমে সিল্কের উপরও লেখা হয়।

পাঁচ রাজার কথা ঃ পুরানো দিনে চীনের মানুষ বিশ্বাস করতেন, একের পর এক পাঁচজন রাজা তাঁদের উন্নতির ব্যবস্থা করেছিলেন।

সম্রাট ফুসি এবং তাঁর রাণী প্রচলন করেছিলেন বিয়ে, সঙ্গীত, লেখা, ছবি আঁকা, মাছ ধরা, পশুপালন, রেশমের গুটি পালন। **সম্রাট সেন নুঙ** প্রচলন করেন কৃষি, কাঠের লাঙ্গল, ব্যবসা ও বাজার, গাছপালা থেকে ওষুধ তৈরি করা। **সম্রাট হুয়াংটী** দিয়েছেন চাকা, প্রথম ইটের বাড়ী। **সম্রাট ইয়াও** তাঁর প্রাসাদের বাইরে একটি ঢাক রেখেছিলেন যেন প্রজারা ঢাক বাজিয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং তাঁর কাছে নিজেদের কথা বলতে পারেন।

সম্রাট সান করলেন হোয়াংহোর সাথে লড়াই। তাঁর ইঞ্জিনিয়ার "উ" **নয়টি পাহাড় ভেদ করে** জলের পথ বানিয়ে, **নয়টি হ্রদে** সেই জল সঞ্চয় করে, **নয়টি নদীর বন্যা রোধ করেছিলেন।** তিনি না থাকলে "চীনের মানুষ জলের মাছ হয়ে যেত।"

একের পর এক রাজাদের সম্বন্ধে এই সব কাহিনী থেকে চীন সভ্যতার ধারাবাহিক উন্নতির আভাস পাওয়া যায়।

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে ঃ—

১। চীনের দুঃখ হোয়াংহোকে চীনের মানুষই সুখের নদীতে পরিণত করেছেন।

২। বন্যার বিরুদ্ধে লড়াই করেই চীনে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

৩। কাগজের ব্যবহার এবং নিজস্ব লিপি সৃষ্টির জন্য চীনের মানুষও অনেক কষ্টসাধ্য এবং গৌরবজনক কাজ করেছেন।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ –

(ক) চীনের দুটি প্রধান নদীর নাম বল। (খ) কোন নদীটিকে চীনের দুঃখ বলা হত? (গ) চৌ কৌ তিয়েনে কি পাওয়া গেছে? (ঘ) সেই আবিষ্কার থেকে কি ধারনা করা যায়?

করবার মত কাজ

হোয়াংহো এবং ইয়াং সি কিয়াং নদী দেখিয়ে চীনের মানচিত্র আঁকবে।

'ঘ" অংশ থেকে পরীক্ষা

মোট নম্বর ৫০ ; সময় ১½ ঘণ্টা

১। খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ :— ৪ × ৫ = ২০

(ক) 'এ্যানড্রুজ' এর গবেষণা থেকে কি বোঝা গেছে ? (খ) নূতন পাথর যুগের পরিচয় চীনের কোথায় কোথায় পাওয়া গেছে ? (গ) কোন কোন নদীর জলে চীনের সমভূমি উর্বর হয় ? (ঘ) চীনের লিপি কি ভাবে সৃষ্টি হয় ? (ঙ) বন্যার বিরুদ্ধে চীনের মানুষের লড়াইয়ের গুরুত্ব কী ?

২। পুরো উত্তর লেখ :— ১০ × ৩ = ৩০

(ক) চীনে মানুষের সৃষ্টি এবং সভ্যতার সূচনা সম্বন্ধে একটি লোক কাহিনী লেখ। (খ) চীনে দৈববাণীর কদর ছিল কেন ? কিভাবে দৈববাণী হত ? (গ) পাঁচ রাজার কাহিনী থেকে চীনে সভ্যতার ধারাবাহিক বিকাশ সম্বন্ধে কি রকম ধারনা করা যায় ?
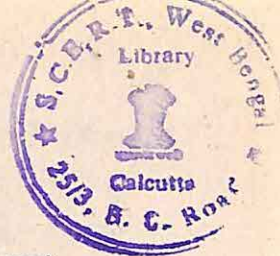
ষষ্ঠ অধ্যায়

তামা-ব্রোঞ্জ যুগের শেষ : লোহা যুগের সূচনা

"তামা-ব্রোঞ্জ যুগের শেষ" বলা হলেও তামা কিম্বা ব্রোঞ্জের ব্যবহার কিন্তু শেষ হল না। তামার পয়সা তো সেদিনও ছিল। আলিম্পিকে তো এখনও ব্রোঞ্জ পদক দেওয়া হয়! **নদী উপত্যকাতে যে সব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, পৃথিবীর সভ্যতায় তাদের দান আমরা নানাভাবে এখনও ভোগ করছি।**

নদী উপত্যকা সভ্যতাগুলির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্যও ছিল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় সভ্যতা এগিয়েছে অসমানভাবে। আজও পৃথিবীর দেশে দেশে অসমতা আছে। কিন্তু মিলও আছে।

নদী উপত্যকা সভ্যতাগুলিতে পরস্পরের সাদৃশ্য

অবস্থান : সব নদী-উপত্যকা সভ্যতাই গড়ে উঠেছিল বড় বড় নদীর অববাহিকায়। নদীর জলস্রোত ছাড়াও সে সব জায়গায় তামা ও ব্রোঞ্জের সুবিধে ছিল।

কৃষি, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, ফসল ও খাদ্য : তখন কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকা। সব জায়গাতেই বাঁধ বেঁধে বন্যার জল ঠেকিয়ে বাড়তি জলে জমিতে সেচ হয়েছে। গম, যব, বার্লি ছিল প্রধান ফসল। নদীর মাছ, শিকারের পশু, গৃহপালিত পশুর মাংসও ছিল খাদ্য।

ধাতুর ব্যবহার : তামা ও ব্রোঞ্জই ছিল প্রধান ধাতু। এই দুটি ধাতুর মধ্যে কোথাও একটি, কোথাও দুটিই চলেছে।

কারিগরি ও শ্রমবিভাগ : ধাতু আবিষ্কারের ফলে বিশেষ বিশেষ কারিগরি বিদ্যা এবং কারিগর শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। শ্রম বিভাগ হয়েছে। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা দৃঢ় হয়েছে।

বাণিজ্য ও বণিকশ্রেণী : শ্রম বিভাগের ফলে বিভিন্ন মানুষের তৈরি বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে বিনিময় দরকার হয়েছে সকলেরই।

বিনিময়ের কাজ করেই সৃষ্টি হয়েছে বণিক শ্রেণী। বিভিন্ন দেশের মধ্যেও বাণিজ্য হয়েছে স্থলপথে, নদীপথে, এমনকি সমুদ্রপথেও।

নগর বন্দর : বিনিময়ের সুবিধের জন্য প্রধানতঃ কারিগর আর বণিকদের নিয়ে তৈরি হল নগর এবং বন্দর। ক্রমে ক্রমে নগরই হয়েছে শাসনকেন্দ্র, ধর্মকেন্দ্র। এইজন্য অনেক সময় এদের "নগর কেন্দ্রিক সভ্যতাও" বলে।

বংশগত রাজপদ : তখনও মানুষ গোষ্ঠীর মধ্যেই দলবদ্ধ ছিল। কিন্তু কোন কোন গোষ্ঠী বড় অঞ্চল জুড়ে "রাজ্য" প্রতিষ্ঠা করেছিল। গোষ্ঠীপতি অথবা পুরোহিতই হলেন রাজা।

প্রশাসন ও আইন : রাজ্য যখন হল, রাজা যখন হলেন, তখন কিছু কিছু আইনও হল। খাজনা ও ট্যাক্সের ব্যবস্থা হল। পরাজিতদের থেকে জরিমানা আর উপঢৌকন আদায়ের ব্যবস্থা হল। এইসব কাজ করবার জন্য রাজার কর্মচারী এবং কেরাণী (লেখক) তৈরি হলেন। আইনের সাথে সাথেই এল বিচার এবং দণ্ডদানের ব্যবস্থা। (অবশ্য এইসব বিষয়ে সুমের, মিসর, ভারত ও চীনের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য ছিল)।

ভাষা ও লেখা : ভাষার উন্নতি হল, লেখারও প্রচলন হল—সব জায়গাতেই। ব্যবসা বাণিজ্যের হিসেব তো রাখতেই হয়। সুতরাং সংখ্যা আর গণিত এল। ব্যবসায়ের লেনদেন লেখা হল। পুরোহিতের মন্ত্রতন্ত্রও লেখা হল সব জায়গাতেই।

ধর্ম ও টোটেম : নদী উপত্যকা সভ্যতার সব কয়টি জায়গাতেই পুরোহিতের ক্ষমতা ক্রমেই বেড়েছিল। পুরোহিতরা মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক করে বেশ প্রভাবশালী হয়েছিলেন।

তখনকার মানুষ আলো, বাতাস, জল, বজ্র, বিদ্যুৎ, মাটির মত প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির পূজো করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন নামে সূর্যদেবতা এবং বসুমাতা অর্থাৎ মাতৃদেবীর পূজো ছিল সব জায়গাতেই।

তাছাড়া বিশেষ বিশেষ প্রাণী কিম্বা গাছকেও আরাধ্য দেবতার

বিশেষ একটি দ্বিতীয় রূপ, অর্থাৎ গোষ্ঠীর জ্ঞাতি এবং মঙ্গলময় শক্তি মনে করে পূজো দেওয়া হয়েছে। একেই বলে টোটেম।

মন্দির ও সমাধি; স্থাপত্য শিল্প ঃ দেবতা এলেন। সাথে সাথে এল মন্দির। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে। আত্মার জন্য থাকবার জায়গা তো চাই! সমাধির উপর তৈরি হল সৌধ। মিসরে এই ভাবনাটি ছিল খুবই প্রবল। কিন্তু অন্য সব জায়গাতেও কম বেশী ছিল। ইট আর পাথরে তৈরি হল মন্দির আর সমাধি। শিল্প এবং স্থাপত্যও উন্নত হল।

উপকথা ঃ জীবন, মৃত্যু, পুনর্জন্ম সম্বন্ধে নানা ধরনের রূপকথা, উপকথা, লোকগাথা সব জায়গাতেই কম বেশী ছিল। বন্যার বিরুদ্ধে লড়াই করেই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সে জন্যই মহাপ্লাবন এবং প্লাবনের পরে নূতন সৃষ্টি সম্বন্ধে উপকথা সব জায়গাতেই ছিল।

শ্রেণী বিভাগ ঃ নয়া-পাথর যুগের পরে শ্রম বিভাগ এবং ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে সমাজে শ্রেণী বিভাগ হয়েছে খুবই তাড়াতাড়ি। সবচেয়ে উপরে ছিলেন রাজা এবং পুরোহিত ও তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গ। তার পরের ধাপে ছিলেন রাজকর্মচারী, বণিক, লেখকের দল। তারপর ছিলেন এমন কিছু কৃষক ও কারিগর যাঁরা দাসত্বে বাঁধা ছিলেন না। সবচেয়ে নীচে ছিল দাস শ্রেণী। কিছু হেরফের থাকলেও এই রকম অবস্থা প্রায় সব জায়গাতেই ছিল। নদী-উপত্যকা সভ্যতার জৌলুস অনেকটাই তৈরি হয়েছিল দাস-শ্রম দিয়ে, একথা খুব তেতো হলেও সত্যি।

আমাদের ঋণ ঃ এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও নদী-উপত্যকা সভ্যতাগুলি মানব সভ্যতার বনিয়াদ তৈরি করেছে। কিন্তু সেই বনিয়াদেই তো আর থেমে থাকে নি! থেমে থাকলে আজ আমরা এত সভ্য হতাম কি করে? সেই পুরানো বনিয়াদের উপরেই তৈরি হয়েছে মানব সভ্যতার বিরাট প্রাসাদ। তামা ব্রোঞ্জের পরে এসেছে লোহার যুগ। আজও চলেছে। "লোহা যুগ" সূচনার কথাই এখন একটু শোন!

লোহা যুগের সূচনা ও বিশেষত্ব

পৃথিবীতে ধাতুর ব্যবহার সুরু হওয়ার পরেও প্রথম দু' হাজার বছর চলেছিল তামা-ব্রোঞ্জের যুগ। ঐ সময়ের মধ্যেই কোন সময়ে লোহার পরিচয়ও মানুষ পেয়েছিল। উল্কাপিণ্ড থেকে নেওয়া সামান্য লোহা পাওয়া গেছে সুমের এবং মিসরে।

কিন্তু লোহার অস্তিত্ব তখনও ছিল নামে মাত্র। **যখন থেকে সব কাজে কর্মে, যন্ত্রে জিনিসে হাতিয়ারে লোহার প্রচলন হল, তখন থেকেই "লোহা যুগের" সূচনা** হয়েছে বলা চলে।

মহাশূন্য থেকে যে উল্কা মাটিতে পড়ে (যাকে আমরা বলি "তারা খসা"), সেই পিণ্ড থেকেই চার হাজার বছর আগেকার মানুষ নিজের পরিশ্রমের জোরে লোহা বার করে নিয়েছিলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে খনিজ লোহার পিণ্ড গালাই করে হাতুড়ি পিটিয়ে পেটাই লোহা তৈরি করেছেন। এই ধরনের খনির চিহ্ন পাওয়া গেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। লোহা গালাই ব্যবস্থার চিহ্ন পাওয়া গেছে রোডেসিয়ায়। কিন্তু তখনও লোহা ছিল খুবই কম এবং খুবই দামী।

লোহার প্রচলন

৩৫০০ বছর আগে থেকে অবশ্য লোহার ব্যবহার চালু হয়েছে খুবই তাড়াতাড়ি। লোহা চালু হয়েছে মিসরে, গ্রীসে, ভারতে। লোহা ঢালাইয়ের কৌশল তৈরি হয়েছে। আজ আমরা কাঁচা লোহা, পেটাই লোহা, ঢালাই লোহা, ইস্পাত ব্যবহার করি। কল-কারখানা, জাহাজ, রেল, বাস, মোটর, ট্রাম, লাইটপোস্ট, বাড়ী তৈরির কড়ি-বর্গা, আবার কাস্তে, লাঙ্গল, ট্রাক্টর, এমনকি রান্নাঘরের "স্টেনলেস্ ষ্টীলের" থালা বাসনেও লোহা ব্যবহার করি। ৩৫০০ বছর আগে থেকে এই পর্যন্ত আমরা লোহাতে ভর করে সভ্যতার পথে এগিয়েছি। কিন্তু একবার কি ভেবে দেখি মানুষেরই শ্রমে, মানুষের ঘামে তৈরি হয়েছে এই সভ্যতা?

লোহা আবিষ্কারের পরে যে **সব দেশ তাড়াতাড়ি লোহা ব্যবহার করতে পারল, সভ্যতার পথে তারাই এগিয়ে গেল।** মিসর, ব্যাবিলন, এ্যাসিরিয়া কিছুদিন ক্ষমতা দেখাল। তারপর একে একে নিভে গেল। তার বদলে বড় হল গ্রীস, রোম, চীনের সাম্রাজ্য এবং ভারতেও মৌর্য ও গুপ্ত রাজাদের সাম্রাজ্য।

লোহা আবিষ্কারের ফল

লোহা ব্যবহারের ফলে **মানুষের জীবনযাত্রাই অনেক পালটে গেল।** লোহার লাঙ্গল হল। ফসলের পরিমাণ বাড়ল। লোহার কারিগররা যন্ত্রপাতি নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে গেল। গ্রাম-শহরের মানুষ এদের দিয়ে দরকারী জিনিস তৈরি করাতে পারল। কারিগরদের দক্ষতা বাড়ল। স্থলপথে এবং জলপথে যাতায়াতের নূতন ধরনের **যানবাহন** তৈরি হল। ব্যয় হল অনেক কম।

কিন্তু লোহা দিয়ে তো **অস্ত্রও তৈরি হল।** সৈন্যবাহিনী সাজিয়ে রাজারা বড় বড় সাম্রাজ্য গড়লেন। পরাজিত দেশে উপনিবেশ করলেন। সাম্রাজ্যের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থারও উন্নতি হল। পরাজিত দেশ থেকে সম্রাটরা পেলেন উপঢৌকন, কর এবং নজরানা। সাম্রাজ্যের মধ্যে বহু ভাষার আদান-প্রদান হল। শহরগুলি হল বহু ভাষাভাষি, বহু জাতির মানুষের বাসস্থান। বাণিজ্য এবং উপনিবেশগুলির মারফৎ সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। **ফিনিসীয়া, ক্রীট, গ্রীস এবং ভারতের কাছে এজন্যই মানব সভ্যতার ঋণ অনেক।**

পারস্য সম্রাটরা সুসা থেকে সার্ডিস্ পর্যন্ত ১৭০০ মাইল রাস্তা তৈরি করেছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এই রকম রাজপথে ভ্রমণ করেই ঐতিহাসিক বিবরণ লিখে রেখে গেছেন।

ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ল। কিন্তু সাধারণ গরীব মানুষ কি করে জিনিসপত্র কিনবেন? সুতরাং এখন থেকে প্রায় ২৭০০ বছর আগেই **ভগ্নাংশ মুদ্রা চালু হল।** খুচরো কেনা বেচা বাড়ল। কিন্তু বেশী বেশী পণ্য তৈরি করতে মোটা মূলধন চাই। মূলধনের যোগান

বাড়াতে গিয়ে সুদখোর লগ্নীকারের কাছে কারিগরদের ধার করতে হল। উৎপাদনের যন্ত্রপাতিও অনেকের বন্ধক রাখতে হল।

কিন্তু সমাজের উচ্চশ্রেণী খুবই ফুলে ফেঁপে উঠল। পরিশ্রম না করেও তাঁরা পারলেন। ধনী হলো বণিক শ্রেণীও। আর দাসদের অবস্থা ? পায়ে আর গলায় বেড়ি পরে তারা শুধু খেটেই মরলো, পেলনা কিছুই।

* * * *

লোহা যুগের সূচনা থেকে প্রাচীনকালের যে কথা এইমাত্র শুনলে, হুবহু ঠিক তেমন ভাবেই সভ্যতার বিকাশ সব দেশে হয়নি। কোথাও আগে, কোথাও পরে হয়েছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে অনেক। তাইতো দেখা যায় মালয়ের জঙ্গলে, মধ্য আফ্রিকায়, উত্তর-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়, দক্ষিণ অফ্রিকায়, মেরু অঞ্চলে পাথর যুগের জীবনযাত্রা আজও অল্প-স্বল্প আছে। আমাদের দেশেই বহু আদিবাসী গোষ্ঠী আজ পর্যন্তও অনেক পিছিয়ে আছে। নাগাভূমি এবং মিজোরামবাসী, হিমালয়ের পর্বতবাসী, মধ্য ভারতের বনবাসী এবং পশ্চিমবঙ্গবাসীর জীবনযাত্রায় পার্থক্য এখনও আছে।

* * * *

তবে সাধারণভাবে যেমন করে লোহা যুগের সভ্যতা প্রাচীনকালে এগিয়েছিল, সেকথাই কয়েকটি উদাহরণ থেকে তোমরা বুঝবে।

এই যুগের মধ্যেই বিভিন্ন সময় আমেরিকা ভূভাগে মায়া সভ্যতা, আজটেক সভ্যতা এবং অন্যান্য দেশেও কয়েকটি সভ্যতার ছোট ছোট কেন্দ্র সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু যে সব দেশের কথা সারা পৃথিবীর পক্ষেই মূল্যবান, আমরা সেইসব দেশের উদাহরণই দেব। ব্যাবিলন ও এাসিরিয়া, মিসর, চীন, ভারতের কথা জানবে। নূতন করে জানবে প্যালেস্টাইন, পারস্য, গ্রীস ও রোমের কথা।

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে :—

১। মানুষের সভ্যতা অনেকদিন ধরে অনেক বড় হয়েছে। আজ আমরা অনেক সভ্য হয়েছি। কিন্তু অতীতের সাফল্যগুলির চিহ্ন আজও আছে।

২। প্রায় একই সময়, একই রকম অবস্থায় নদী-উপত্যকা সভ্যতাগুলি সৃষ্টি হয়েছিল বলে সবগুলির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ছিল।

৩। যখন থেকে মানুষের ব্যবহারের প্রধান ধাতু হয়েছে লোহা, তখন থেকেই সুরু হয়েছে লোহা যুগ।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :—

(ক) উল্কাপিণ্ডের লোহা বলতে কি বুঝায়? (খ) পেটাই লোহা কাকে বলে? (গ) লোহা-গালাই কারখানার চিহ্ন কোথায় পাওয়া গেছে? (ঘ) আমাদের রোজকার জীবনে এখন আমরা কি কি কাজে লোহা ব্যবহার করি?

করণীয় কাজ

নদী-উপত্যকা সভ্যতার জায়গাগুলি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মানচিত্র আঁকবে এবং একখানা বড় কাগজে সেগুলি পর পর লাগাবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে পরীক্ষা

সময়=৩ ঘণ্টা ; মোট নম্বর=১০০

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :— ৫×৭=৩৫

(ক) লোহা যুগ বলতে কি বুঝায়? (খ) ভগ্নাংশের মুদ্রা চালু হওয়ায় ব্যবসায়ের কি সুবিধে হয়েছে? (গ) লম্বা রাজপথ তৈরি হওয়ায় যাঁর ভ্রমণের সুবিধে হয়েছিল, এমন একজন প্রাচীন ঐতিহাসিকের নাম লেখ। (ঘ) সুসা থেকে সার্ডিস্ পর্যন্ত কতখানি রাজপথ তৈরি হয়েছিল? (ঙ) সে যুগে শহর গুলিতে নানা জাতির মানুষের বাস হয়েছিল কেন? (চ) লোহার অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হওয়ায় রাজাদের কি সুবিধে হয়েছিল? (ছ) এমন কয়েকটি জায়গার নাম লেখ যেখানকার মানুষ এখনও সভ্যতায় পিছিয়ে আছেন।

২। দশ লাইন করে লিখে উত্তর দাও :— ৯×৫=৪৫

(ক) লোহা আবিষ্কারের ফলে মানুষের কাজকর্মে কি পরিবর্তন এসেছিল? (খ) উপনিবেশের সাথে সম্রাটের কি ধরনের সম্পর্ক ছিল? (গ) লোহা আবিষ্কারের ফলে সভ্যতার বিস্তার হয়েছিল, একথা বলা হয় কেন? (ঘ) লোহা যুগে অভিজাত এবং বণিকরা অসম্ভব ধনী হল কেন? (ঙ) সভ্যতার উন্নতি সত্ত্বেও দাসদের অবস্থা কিরকম ছিল?

৩। নদী-উপত্যকা সভ্যতাগুলির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল লেখ। ২০

সপ্তম অধ্যায়

লোহা যুগের সূচনায় মানব সভ্যতা

লোহার ব্যবহার সুরু হওয়ার পরে যে সব দেশ বড় হয়ে উঠেছিল, তাদের উদাহরণ থেকেই মানব সভ্যতার কথা আমরা বুঝব।

(১) ব্যাবিলনের সভ্যতা

যে জায়গায় সুমের সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, সেই জায়গা এবং আরও কিছু জায়গা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাবিলনের সভ্যতা।

শক্তিশালী সুমের রাজ্য ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়লে ওখানেই নূতন একটি বড় রাজ্য তৈরি হয়। এই রাজ্যটিই ব্যাবিলন। এর রাজধানীও ছিল ব্যাবিলন শহর। রাজা হামুরাবি ছিলেন ব্যাবিলনের একজন শক্তিশালী রাজা। অনেকগুলি যুদ্ধ করে তিনি নিজের রাজ্য বাড়িয়েছিলেন।

ব্যাবিলনের ভাঙ্গাগড়া

হামুরাবির মৃত্যুর অল্প দিন পরেই ব্যাবিলনে গোলমাল বাধে। তখনই ব্যাবিলন থেকে ৩০০ মাইল উত্তরে এ্যাসিরিয়া রাজ্যটি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এদের দেবতা "অসুর"-এর নামে রাজ্যটির নাম ছিল এ্যাসিরিয়া। প্রথমে অসুর শহরে এবং পরে নিনেভা শহরে ছিল রাজধানী। নিনেভার লোক-সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ। শহর এবং রাজপ্রাসাদও ছিল সুন্দর।

নিনেভা প্রাসাদের দেওয়াল চিত্র

এ্যাসিরিয়ার শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন অসুরবানিপাল। যুদ্ধবিগ্রহ এবং দাস সংগ্রহেই এ্যাসিরিয়া ছিল বেশী পটু। এই রাজ্যও ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্যাবিলন আবার শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাবিলনের এই নূতন রাজ্যের একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন নেবুকাডনেজার।

কিন্তু রাজাদের কাহিনীতে আমাদের তেমন দরকার নেই। ব্যাবিলনের সাধারণ মানুষের কথাই আমাদের বেশী জানা চাই।

ব্যাবিলনের কৃষি ও খনিজ দ্রব্য

বৃষ্টি আর নদীর প্লাবনে, জলসেচ এবং ভাল চাষের জোরে ব্যাবিলন হয়েছিল ফল ও ফসলের নন্দনকানন। বলদে টানা লাঙ্গলের সাথে লাগানো একটা নলের মুখ দিয়ে বীজ ছড়ানো হত। প্রত্যেক খণ্ড জমিতেই ছিল আল বাঁধা। এর চিহ্ন আজও আছে। বন্যার জল ধরে রাখবার জন্য ১৪০ বর্গ মাইল আয়তনের জলাধারও ছিল। নালা দিয়ে সেই জল মাঠে দেওয়া হত। ঢেঁকি-কল দিয়েও জলসেচ হত, আজও যেমন আমাদের গরীব চাষীরা করেন।

ব্যাবিলনের চাষী

খাদ্য ফসল ছাড়া ফল, খেজুর ও বাদামের বাগিচাও ছিল। আঙ্গুর এবং জলপাইয়ের চাষ গ্রীস রোমে গিয়েছিল এখান থেকেই। ব্যাবিলনীয়রা তামা, সীসে, রূপো, সোনা এবং লোহা ব্যবহার করতেন। তুলো আর পশমের নক্সাকাটা কাপড়ও ব্যবহার করতেন।

বাণিজ্য ও পরিবহন

বাসন তৈরির মাটি, বিটুমেন, নলখাগড়া ছিল ব্যাবিলনে প্রচুর। কিন্তু কাঠ, পাথর ছিল না। ধাতুও বেশী ছিল না। সেজন্যই ব্যাবিলন থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানি হত। অন্যান্য দরকারী জিনিস আমদানি হত। কারিগররাও ছিলেন ওস্তাদ। চাষী এবং পশু-পালকদের হাতিয়ার তাঁরাই তৈরি করতেন। ব্যাবিলন হয়েছিল বড় ব্যবসাকেন্দ্র।

শস্য বোঝাই ব্যাবিলনীয় নৌকো

গাধায় টানা গাড়ী এবং উটই ছিল স্থলপথে বানিজ্যের প্রধান পরিবহন। নেবুকাডনেজারের সময় রাস্তাঘাটেরও উন্নতি হয়। উটের বহরে পণ্য আসত ভারত, মিসর, এশিয়া মাইনরের অনেক জায়গা থেকে। ইউফ্রেটিসে চলতো মালবাহী নৌকোর বহর।

অর্থের লেনদেন

অর্থের লেনদেন এবং লগ্নীর ব্যবস্থা ছিল। ওজন করে সোনা রূপো দিয়েও জিনিসের কেনাবেচা হত। ব্যাবিলনের জৌলুস হয়েছিল বাণিজ্যের উপর ভর করে। যে সব লেখা পাওয়া গেছে, তার বেশীর ভাগই হল কেনা-বেচা, ধারদেনা, চুক্তি, অংশীদারী, উইল ইত্যাদির দলিল। শতকরা ২০ থেকে ৩৫ ভাগ সুদে ধার দেওয়া হত। **প্রতি-পত্তিশালী পরিবারগুলি প্রচুর লগ্নী কারবার করত।** পুরোহিতরা কৃষকদের ধার দিতেন। সম্পত্তি রক্ষার আইন ছিল। দেনাগ্রস্ত মানুষ নিজের ছেলেকে পাওনাদারের হাতে তুলে দিতেন।

শিক্ষা দীক্ষা

বাণিজ্যের কাজে প্রচুর ব্যবহারের ফলে কুনীফর্ম লিপিরও অনেক উন্নতি হয়। অসুরবানিপালের গ্রন্থাগারের ত্রিশ হাজার লেখা প্লেটের এক চতুর্থাংশই হল ব্যাকরণ ও অভিধান। মন্দির এবং বাণিজ্যের হিসেবও লেখা হত। দলিলও লেখা হয়েছে। ব্যাবিলনীয়রা গণিতের 'সংখ্যা', গুণের নামতা এবং দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যও স্থির করেছিলেন। সৌর এবং চান্দ্র ক্যালেণ্ডারও তৈরি করেছিলেন।

বাড়ীঘর ও মন্দিরের স্থাপত্য

ব্যাবিলনের রাজারা প্রজাদের খাজনা এবং পরাজিত রাজাদের উপঢৌকন ঢেলেছিলেন ব্যাবিলন শহরটিকে সাজাতে। ২০০ বর্গমাইল শহরটিকে ঘিরে ৫৬ মাইল লম্বা এমন দেয়াল হেরোডোটাস দেখে-ছিলেন যার উপর দিয়ে চারটি ঘোড়া পাশাপাশি ছুটতে পারে।

ধনীদের বাড়ীগুলি ছিল ইটের তৈরি। নেবুকাডনেজারের সময়কার ইটে ছাপ ছিল "আমি নেবুকাডনেজার, ব্যাবিলনের রাজা"। সাধারণ মানুষের বাড়ীতে ছিল খড় মেশানো মাটির দেয়াল অথবা কাঁচা ইটের গাঁথুনি। (আমাদের গ্রামগুলোতে তো আজও মাটির দেয়াল এবং খড়ের ছাউনির ঘর হরদম দেখা যায়।)

ব্যাবিলন শহরের মাঝখানে ছিল "ব্যাবিলনের টাওয়ার"। পিরামিডের চেয়ে উঁচু (৬৫০ ফুট), মাথায় সোনার টুপির সাততলা জিগুরাট। কাছেই ছিল মার্দুক মন্দির। শহরের সীমানায় ছিল নেবুকাডনেজারের প্রাসাদ। তার কাছেই ছিল পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি—ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান।

ব্যাবিলনের ধর্মবিশ্বাস

আমাদের দেশে কথা আছে "তেত্রিশ কোটি দেবতা"। ব্যাবিলনের লোকদেরও প্রতিটি শহর, গ্রাম এবং পরিবারেও ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী ছিলেন। প্রধান দেবতা অবশ্য ছিলেন সূর্য, চাঁদ, পৃথিবী ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে প্রধান দেবতার সংখ্যা আরও কমে দাঁড়ালো দু'জনে। প্রথম মার্দুক—অর্থাৎ সূর্যদেবতা; দ্বিতীয় ইস্তার—সৌন্দর্য, ভালবাসা, মাতৃত্ব এবং উৎপাদনের দেবী।

ব্যাবিলনের মানুষও বিশ্বাস করতেন স্বর্গ আছে, নরকও আছে। ইহজগতের কাজের জন্য মৃত্যুর পরে কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

ব্যাবিলনের পুরোহিত

স্বর্গ নরকে বিশ্বাস এবং সংস্কার যেখানে বেশী, পুরোহিতদের ক্ষমতাও সেখানে বেশী। ব্যাবিলনের রাজাও ছিলেন নগর দেবতার সেবক। ট্যাক্স আদায় এবং আইন জারি হত দেবতার নামে।

মার্দুকের মিছিলে রাজা যোগ দিতেন পুরোহিতের পোশাকে। (পুরীতে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার সময় পুরীর রাজাই রথ চলবার রাস্তায় ঝাড়ু লাগাতেন)। 'দেবতার রাজ্যে' বিদ্রোহ ছিল অধর্মের কাজ। দেবদেবীর এত প্রাধান্যের ফলে পুরোহিতদেরও ছিল অসম্ভব প্রতাপ।

ধর্ম বিশ্বাসের বাড়াবাড়ির ফলে **মন্দিরগুলি ছিল ঐশ্বর্যে ভরা।** রাজারা মন্দির বানিয়ে দিতেন। আসবাব দিতেন। জমি এবং বার্ষিক অর্থ দিতেন। পুরোহিতদের হাতে অসংখ্য দাস তুলে দিতেন। যুদ্ধজয়ের পরে 'দেবতার' তুষ্টির জন্য অজস্র সম্পদ ঢেলে দেওয়া হত। প্রজারাও দিতেন ফসল, পশু এবং দেবোত্তর জমি।

ব্যাবিলনের দানব মূর্তি

এই অজস্র সম্পত্তি ছিল পুরোহিতদের হাতে। "দেবতার জমিতে" তাঁরা চাষবাস করাতেন, দাস খাটাতেন, কারিগরদের দিয়ে শিল্পপণ্য তৈরি করাতেন, লগ্নী কারবার করতেন, জিনিস কেনাবেচা করতেন। আবার দলিল লেখক, চুক্তিপত্রের সাক্ষী, সরকারী দলিলের জিম্মাদার এবং বিচারকও ছিলেন। এই সব কারণেই বলা হয়—**"ব্যাবিলনের সম্পদ সৃষ্টি করেছিলেন বণিকরা। সেই সম্পদ ভোগ করেছেন পুরোহিতরা।"**

হামুরাবির আইনবিধি

নির্দিষ্ট আইন অনুসারে শাসন করতে চেয়েছিলেন বলে রাজা হামুরাবি আইনবিধি জারি করেছিলেন। প্রজারা যেন মেনে চলে এজন্য তিনি প্রচার করেছিলেন যে **ঈশ্বরের কাছ থেকেই তিনি আইনবিধি পেয়েছেন।** একটি পালিশ

করা পাথর স্তম্ভের গায়ে কুনীফর্ম লিপিতে ছোট ছোট অক্ষরের খোদাই করা লেখাগুলির মধ্যেই আছে **২৮৫টি আইনের ধারা এবং আইন ভাঙ্গবার শাস্তি।**

হামুরাবির আইন স্তম্ভ

আইন ছিল যে আঘাত করলে সমান সমান প্রত্যাঘাতই হবে সাজা। (যেমন হাতের বদলে হাত, চোখের বদলে চোখ, ছেলের বদলে ছেলে)। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আর্থিক **জরিমানা** দিয়েও রেহাই পাবার ব্যবস্থা হল। আবার **একই অপরাধে ধনিদের জরিমানার চেয়ে সাধারণ মানুষের জরিমানা ছিল ছয় গুণ বেশী।** সুতরাং ধনীদের পক্ষে অপরাধ করতে তেমন বাধা ছিল না। চুরি, ডাকাতি, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানো, বাবার উপর ছেলের অত্যাচার, কাজে কর্মে ডাক্তারের অবহেলা প্রভৃতির জন্যও সাজা নির্দিষ্ট ছিল।

জমিদারির মালিকানা, জমির খাজনা, সম্পত্তির অধিকার, দত্তকের আইনও ছিল। ব্যবসায়ের চুক্তি, ধারদেনা, বৃত্তি ও পেশা, কর্মচারী ও দাসদের সম্বন্ধেও আইন ছিল। **ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে 'পবিত্র' জ্ঞানে রক্ষা করবার নীতিতেই আইন তৈরি হয়েছিল।**

রাজমিস্ত্রী, দর্জি, ছুতোর মিস্ত্রী, মাঝিমাল্লা, রাখাল এবং সাধারণ শ্রমিকের কাজের নিয়ম এবং মজুরির আইনও ছিল। এমন কি বাড়ী তৈরি কিম্বা নগর পরিকল্পনাও আইনে বাঁধা ছিল। অন্যদিকে বিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ, দ্বিতীয়বার বিয়ে, স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব, বিধবার বিয়ে সম্বন্ধেও আইন ছিল। **সবচেয়ে বড় করে ছিল দাসদের বিদ্রোহ কিম্বা পালানো সম্বন্ধে আইন।**

হামুরাবির আইনবিধি থেকে সেই সময়ে ব্যাবিলনের সমাজে

ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য, দাসত্বের কঠোরতা, সমাজে বিভিন্ন ধরনের কাজ ও কর্মী, ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতিনীতি, আর্থিক ও পারিবারিক জীবন, চুরি ডাকাতি জুয়াচুরির কথা, রাজা ও অভিজাতদের ক্ষমতা, মানুষের জীবনে দেবদেবী ও পুরোহিতের প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

দাসদের জীবন

এরকম সমাজে সাধারণ দরিদ্রের জীবন যে সুখের ছিলনা একথা সহজেই বুঝা যায়। একদিকে লোভী ধনীরা থেকেছেন বিলাসে, আরামে, বিনা পরিশ্রমে। অন্যদিকে খোলা বাজারে দাস কেনাবেচা হয়েছে, পুরুষ দাস—৫০ থেকে ১০০ মুদ্রায়; মহিলা ২০ থেকে ৬৫ মুদ্রায়। দাসদের ছেলেমেয়েরাও হয়েছে দাস।

দাসরা ছিল প্রভুর সম্পত্তি। তাদের বিক্রি করা যেত, বন্ধক দেওয়া যেত, হত্যা করা যেত, সৈনিক হিসেবে যুদ্ধেও পাঠানো যেত। পলাতক দাসকে আশ্রয় দিলে আশ্রয় দাতাও শাস্তি পেত। পলাতককে ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হত।

ব্যাবিলনের ঐশ্বর্য আর জৌলুস সৃষ্টি হয়েছিল দাসদের শ্রমে। দাসের সংখ্যা ছিল স্বাধীন নাগরিকের সংখ্যার চেয়েও বেশী। **এমন সভ্যতা ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য।** ভিতরের এই ব্যধির ফলে বাইরের আঘাত আসা মাত্রই ব্যাবিলন ভেঙ্গে পড়ল।

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে :

১। বাণিজ্যের সম্পদই বাবিলনকে ঐশ্বর্যশালী করেছিল।

২। সম্পদের বাড়াবাড়ির ফলেই ব্যাবিলনে শ্রেণী বিভেদ ছিল খুবই বেশী।

৩। হামুরাবির আইনবিধি থেকে ব্যাবিলনের অবস্থা বুঝা যায়।

৪। হামুরাবি—খ্রীঃ পূঃ ২১২৩ থেকে ২০৮১।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :—

(ক) এ্যাসিরিয়া নাম হয়েছিল কেন? (খ) এ্যাসিরিয়ার একটি শহরের নাম বল যেখানে ৩ লক্ষ অধিবাসী ছিলেন। (গ) ব্যাবিলনের

রাজধানী কোথায় ছিল ? (ঘ) নেবুকাডনেজার কে ছিলেন ? (ঙ) ব্যাবিলনের মানুষ কোন কোন ধাতুর ব্যবহার শিখেছিলেন ? (চ) হামুরাবি ঈশ্বরের নামে আইন জারি করেছিলেন কেন ? (ছ) কোন ভাষায় ঐ আইন লেখা হয়েছিল ?

করণীয় কাজ

একটি মানচিত্র এঁকে ব্যাবিলন এবং যে সব জায়গা থেকে স্থলপথে ব্যাবিলনে বাণিজ্য পণ্য আসতো সেই জায়গাগুলো দেখাবে।

ব্যাবিলন সম্বন্ধে পরীক্ষা

সময়=৩ ঘণ্টা ; মোট নম্বর=১০০

১। খুব সংক্ষেপে উত্তর লেখ ঃ ১০

(ক) ব্যাবিলনের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজার সবচেয়ে স্মরণীয় কাজ কী ?
(খ) ব্যাবিলনের কয়েকটি বিখ্যাত স্থাপত্য কাজের নাম লেখ।

২। প্রতিটির জন্য পাঁচ লাইন লিখে উত্তর দাও ঃ ৬×১০=৬০

(ক) বীজ বপনের জন্য ব্যাবিলনের কৃষকরা কি কৌশল করেছিলেন ? (খ) কি ভাবে তাঁরা জমিতে জল দিতেন ? (গ) ব্যাবিলনের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের নাম লেখ। (ঘ) স্থলপথে ব্যাবিলনের কি পরিবহণ ছিল ? (ঙ) দেনা শোধ করানোর জন্য কি পদ্ধতি ব্যাবিলনে চালু ছিল ? (চ) : ব্যাবিলনে মন্দিরের সম্পদ এবং পুরোহিতের ক্ষমতা কি ভাবে বৃদ্ধি পায় ?

৩। সম্পূর্ণ উত্তর লেখ ঃ

(ক) হামুরাবির আইন থেকে ব্যাবিলনের অবস্থা কতটা জেনেছ ? সবচেয়ে কঠোর আইন কাদের জন্য তৈরি হয়েছিল ? (খ) ব্যাবিলনের দাসদের জীবন কি রকম ছিল ? (গ) একথা বলা হয় কেন যে ব্যাবিলনকে সম্পদশালী করেছেন বণিকরা, সেই সম্পদ ভোগ করেছেন পুরোহিতরা ?

(২) মিসরের সাম্রাজ্য

মিসরের কথা যে পর্যন্ত শুনেছ, তার পরে সেখানে চলেছিল অরাজকতা। কিন্তু অরাজকতার শেষে হল এক বিশাল সাম্রাজ্য।

মিসরের উপনিবেশ ও করদ রাজ্য

ভূমধ্য সাগর এলাকায় মিসর একাই বাণিজ্য করবে, এই ছিল ফারাওদের লক্ষ্য। এজন্য তাঁরা বারে বারে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন আক্রমণ করেছেন। পরাজিত রাজ্যকে করদ রাজ্য বানিয়ে সেখান থেকে তামা, সোনা, গরু, মোষ, কৃষি পণ্য, মধু, মদ, তেল পেয়েছেন। বিদ্রোহের পথ বন্ধ করবার জন্য পরাজিত রাজার ছেলেকে জামিন রেখেছেন মিসরে। রাজকন্যাদের বিয়ে করেছেন। মিসরের সৈন্য মোতায়েন করেছেন উপনিবেশে, সীমান্ত দুর্গে, নৌবন্দরে। সুদান থেকে এসেছে বিলাসের জিনিস। সিরিয়া প্যালেস্টাইন থেকে এসেছে হাতির দাঁত, চিতাবাঘের চামড়া। পশ্চিম এশিয়া, সাইপ্রাস, ক্রীট থেকেও এসেছে সেলামী।

ফারাওদের কাহিনী

কয়েকজন ফারাওয়ের গল্প শোন। মজা লাগবে, রাগও হবে। এক রাণী বসলেন সিংহাসনে। কিন্তু মিসরের নিয়ম ছিল দেবতা আমনের "ছেলে" ছাড়া কেউ সিংহাসনে বসতে পারবেন না। রাণী তাই পুরোহিতদের দিয়ে ঘোষণা করালেন তিনি আমনের 'পুত্র'।

চতুর্থ আমেনহোটেপের কাহিনী হল ফারাওয়ের সাথে পুরোহিতদের লড়াইয়ের কাহিনী। সম্পদ ভোগ করে পুরোহিতরা হয়েছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ। এই ফারাও ঘোষণা করলেন "উত্তাপ এবং আলোকের করুণাময় দেবতাই" (অর্থাৎ সূর্য) হবেন মিসরের একমাত্র দেবতা। তিনি অন্য সব দেবতার উৎসব বন্ধ করে

দিলেন। সম্পদশালী পুরোহিতের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করলেন। মিসরের মন্দিরগুলিতে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে পুরোহিতরা ব্যবসা করতেন। সেই অর্থের উপর ফারাওয়ের নজর পড়ায় ব্যবসায়ে এল মন্দা। ষড়যন্ত্রী পুরোহিতদের চেষ্টায় ধর্ম ভীরু মানুষদের ক্ষেপিয়ে বিদ্রোহ হল। এই ফারাওয়ের মৃত্যুর পরে তাঁর জামাই টুটেন-খামেনকে হাতের পুতুল করে পুরোহিতরা সিংহাসনে বসালেন। আর একজন বিখ্যাত ফারাও ছিলেন দ্বিতীয় রামাসেস্। নুবিয়া থেকে তিনি আনেন সোনা, প্যালেস্টাইন থেকে ইহুদি দাস। নানা রাজ্যের ধাতুর খনি থেকে ধাতু সংগ্রহ করেন। ব্যবসার সুবিধের জন্য নীল নদ থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত খাল কাটেন। আবু সিম্বেল মন্দিরটির কাজ শেষ করে দরজায় নিজের চারটি বিরাট মূর্তি স্থাপন করেন।

ফারাও দ্বিতীয় রামাসেস্

মিসর সাম্রাজ্যের সফলতা

ফারাওরা বিশাল সাম্রাজ্য গড়বার ফলে বাণিজ্য থেকে মিসরে সম্পদ এসেছে। অধীন রাজাদের সেলামি দিয়ে মন্দির গড়ে সোনার পাতে মোড়া হয়েছে। এর ফলে ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং শিল্পকলারও উন্নতি হয়েছে। বাণিজ্যের তাগিদেই মিসরীয়রা গণিতের দশমিক প্রচলন করেছেন। ত্রিকোণ এবং আয়তক্ষেত্রের পরিমাপ শিখেছেন। (পিরামিড তৈরি করতেই এসব লেগেছিল)। তাঁরা সৌর পঞ্জিকা চালু করেছেন। বৎসরকে মাস ও দিনে ভাগ করেছেন। রসায়ন এবং শারীর বিদ্যায় তাঁদের দক্ষতার প্রমাণ হল মমি।

সমাজ জীবন

এত সম্পদ কিন্তু সাধারণ গরিব মানুষের উপকারে লাগেনি। মিসরের সমাজে তখন ছিল চারটি পরিষ্কার ভাগ। সবচেয়ে উপরে ছিলেন ফারাও। দ্বিতীয় স্তরে পুরোহিত, রাজকর্মচারী, বণিক,
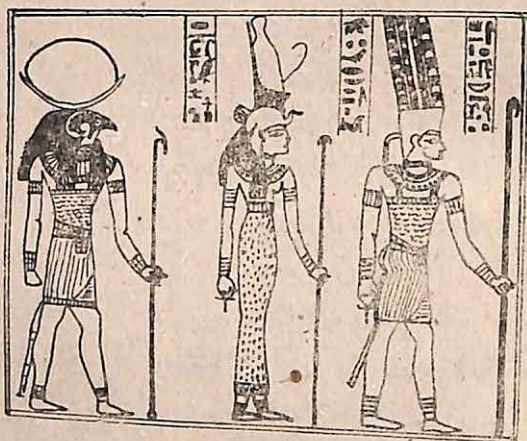
মিসরের দেবদেবী

কারিগর। তৃতীয় স্তরে স্বাধীন কৃষক। সবচেয়ে নাচে ছিল অগণিত দাস। বেশীর ভাগ দাসই ছিল যুদ্ধবন্দি। ফারাও নিজে এবং মন্দির-গুলি (অর্থাৎ পুরোহিতরা) ছিল অধিকাংশ দাসের মালিক।

লুটতরাজ, উপঢৌকন, প্রজার ট্যাক্স থেকে পাওয়া সম্পদ তবে কোথায় যেত? প্রায় সবই যেত মন্দিরে অর্থাৎ পুরোহিতদের হাতে। ফারাও তৃতীয় রামাসেস'এর আমলে মন্দিরগুলির হাতে ছিল এক লক্ষ সাত হাজার দাস (মিসরের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ), সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একর জমি (মিসরের চাষযোগ্য জমির এক সপ্তমাংশ), পাঁচ লক্ষ গরু মোষ। মিসর ও সিরিয়ার ১৬৯টি শহরের রাজস্ব সরাসরি আসতো মন্দিরে। আমন মন্দিরের পুরোহিতদের হাতে তৃতীয় রামাসেস্‌ই দিয়েছিলেন বত্রিশ হাজার কিলোগ্রাম সোনা, দশ লক্ষ কিলোগ্রাম রূপো। প্রতি বছর তাঁদের দেওয়া হত ১৮৫০০০ বস্তা শস্য। তিনটি যুদ্ধ থেকে

বন্দী করা ৬২২২৬ জন দাসের প্রায় সবই তিনি দিয়েছিলেন মন্দিরে। এইসব কথা লেখা রয়েছে "হ্যারিস প্যাপিরাস" নামে পরিচিত খুব লম্বা একখানা প্যাপিরাস কাগজে।

মিসর সাম্রাজ্যের পতন

"ঈশ্বরের" খরচ যোগাতে গিয়ে তৃতীয় রামাসেসের রাজকোষ শূন্য হল। কর্মচারীদের মাইনে দেওয়ার উপায়ও রইল না। আরও ট্যাক্সের জন্য প্রজাদের উপর অত্যাচার বাড়ল। সাধারণ মানুষের জীবনে এল অনাহার এবং বিক্ষোভ। রাজাকে শিখণ্ডি রেখে পুরোহিতরা এতদিন ক্ষমতা ভোগ করছিলেন। এবার প্রকাশ্যেই প্রধান পুরোহিত সিংহাসন দখল করলেন।

মানুষের প্রতি বঞ্চনা এবং দাসত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত মিসরের পক্ষে শত্রুর আক্রমণ ঠেকানো অসম্ভব হল। লিবিয়া, ফিনিসীয়া, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন মিসরের প্রাধান্য ভাঙ্গলো। ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য ছিল মিসর সাম্রাজ্যের জীবনকাঠি। সেই জীবনকাঠি চলে গেল ফিনিসীয়া, ক্রীট, গ্রীস, কর্থেজ ও স্পেনে। মিসর হারালো তার বাণিজ্য, তার সোনা, তার ক্ষমতা, তার শিল্পকলার দক্ষতা।

তারপর? তারপর নটে গাছটি মুড়ালো। স্বাধীনতাও গেল। মিসর হল পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন। তারপর দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। তারও পরে মিসর হল রোম সাম্রাজ্যের একটি অংশ।

মানব সভ্যতায় মিসরের দান

মিসরের সাম্রাজ্য রইল না, ফারাও রইলেন না, পুরোহিতও রইলেন না! কিন্তু মিসরের সাধারণ মানুষ পরিশ্রম করে যা কিছু সৃষ্টি করেছিলেন—তাঁদের কৃষি, ধাতুবিদ্যা, কারিগরি, কাগজ-কালি-লেখা, বর্ষপঞ্জী, জ্যামিতি, চিকিৎসা বিদ্যা, বাড়ীঘর, স্ফিংস—পিরামিডই স্থায়ী হল মানব সভ্যতার ভাণ্ডারে।

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে :

১। মিসরে বিশাল সাম্রাজ্য তৈরী হয়েছিল, অনেক উপনিবেশ হয়েছিল। মিসরে জমা হয়েছিল অঢেল সম্পদ। কিন্তু এই সম্পদে সাধারণ মানুষের উপকার হয়েছে খুবই কম। ধনীরা হয়েছে আরও ধনী। দাসরা রয়েছে জীবন্মৃত হয়ে।

২। সাধারণ মানুষের জীবনে সুখ শান্তি না থাকলে কোন শক্তিশালী সাম্রাজ্যই স্থায়ী হতে পারে না। **চরম শ্রেণী বিভাগের ফলে ভিতরে ভিতরে মিসরের শক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল।**

৩। খ্রীঃ পূঃ ৫২৫ সনে পারস্য, ৩৩২ সনে আলেকজাণ্ডার এবং ৩০ সনে রোম সাম্রাজ্য মিসরকে গ্রাস করে।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :

(ক) মিসর সাম্রাজ্যের কয়েকজন বিখ্যাত ফারাওয়ের নাম বল।

(খ) কোন ফারাওয়ের সাথে পুরোহিতদের বিবাদ হয়েছিল এবং কেন ?

করণীয় কাজ

একটি মানচিত্র এঁকে মিসর এবং তার বিজিত রাজ্যগুলি দেখাবে।

মিসর সাম্রাজ্য সম্বন্ধে পরীক্ষা

সময়=২ ঘণ্টা ; মোট নম্বর=১০০

১। পাঁচ লাইন করে লিখে উত্তর দাও : ৪ × ৯ = ৩৬

(ক) বিদেশে রাজ্য জয় করে ফারাওদের কি লাভ হয়েছিল ?

(খ) উপনিবেশগুলি থেকে কি কি সম্পদ মিসরে আসতো ?

(গ) মিসরের কয়েকটি করদ রাজ্য এবং উপনিবেশের নাম লেখ।

(ঘ) মিসর সাম্রাজ্য দুর্বল হওয়ার পরে কোন কোন রাজ্য মিসরের উপর আধিপত্য করেছে ?

উত্তর লেখ : ১০ × ৬ = ৬০

(ক) দ্বিতীয় রামাসেসের কথা সংক্ষেপে লেখ। (খ) তৃতীয় রামাসেসের সময় মন্দিরগুলির ধনসম্পদ বর্ণনা কর। (গ) কোন অবস্থায় মিসরের প্রধান পুরোহিত সিংহাসন দখল করেন ? (ঘ) মিসর সাম্রাজ্যে শ্রেণী বিভাগ কি রকম ছিল ? (ঙ) কি কারণে মিসর সাম্রাজ্যের পতন হল ? (চ) মিসরের সফলতা এবং মানব সভ্যতায় মিসরের দান সম্বন্ধে লেখ। (হাতের লেখার জন্য—৪)

(৩) পারসিক সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন

অল্পদিন আগে পারস্যে রাজার শাসন শেষ হল। নিশ্চয়ই সেই দেশটির কথা জানতে ইচ্ছে হয়। সে কথাই একটু শোন।
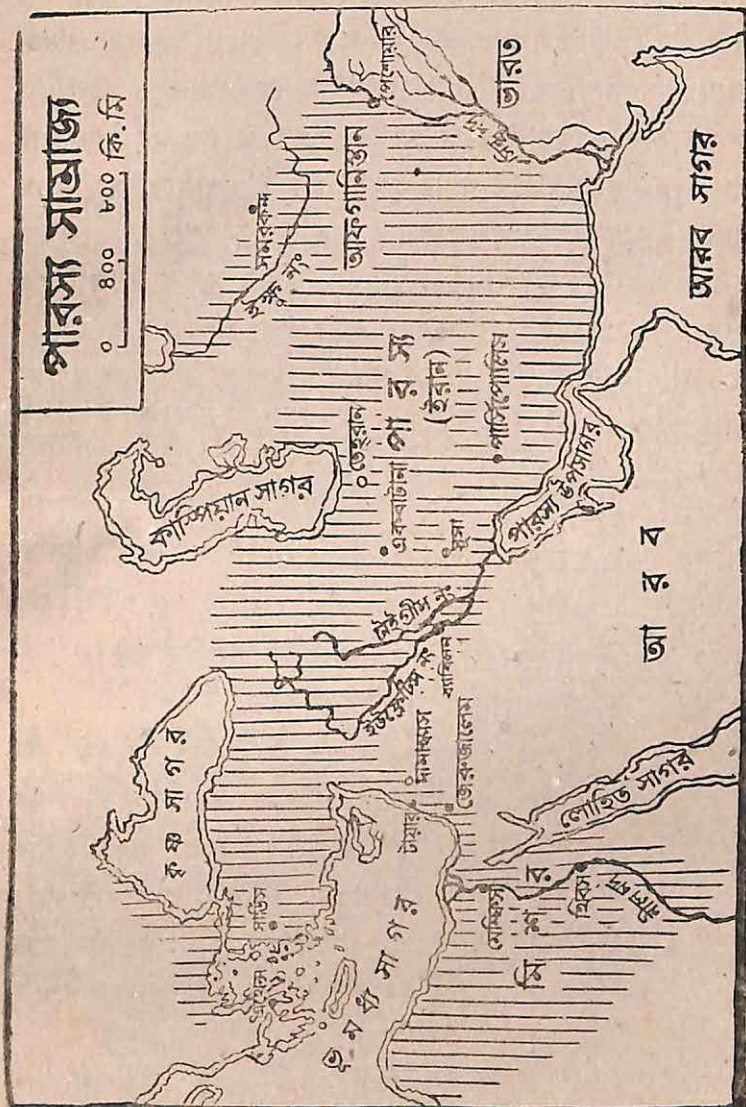
অবস্থান ঃ পারস্য দেশটির প্রাকৃতিক অবস্থান বড়ই অদ্ভুত।

কোথাও উর্বর সমভূমি, কোথাও পাহাড় এবং কোথাও মরুভূমি নিয়ে এই দেশ তৈরি। নদী নালা আছে খুবই কম। তবে ধাতব সম্পদ অনেক আছে। তাছাড়া মধ্য এশিয়া, কাস্পিয়ান সাগর এবং সিন্ধু অঞ্চল থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে প্রাচীন কালে অনেক বাণিজ্য হয়েছে পারস্যের পথেই (মানচিত্রে মিলিয়ে দেখ)।

সভ্যতার ক্রমোন্নতি : আজ যেখানে পারস্য, সেখানে সাত-আট হাজার বছর আগেও ছিল পাথর যুগ। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ওখানকার মানুষ তামা ও ব্রোঞ্জ ব্যবহার করতে শেখেন। লেখার প্রচলনও হয়। কিন্তু ওখানকার মানুষরা ছিলেন অনেক উপজাতিতে বিভক্ত। খুব সহজেই এ্যাসিরিয়া এদের উপর খবরদারি করেছে।

লোহা ব্যবহারের সুরু থেকেই পারসিকদের শক্তি বাড়তে থাকে। কিন্তু তখনও 'পারস্য' বলতে কিছুই প্রায় ছিল না। দক্ষিণ ইরাণের এক ক্ষুদ্র রাজাকে বলা হত "পারসুয়ার রাজা"।

যাই হোক, খ্রীঃ পূঃ ৬১২ সনে মিডিয়া এবং আর কয়েকটি উপজাতি শক্তির আক্রমণে এ্যাসিরিয়ার রাজ্য ভেঙ্গে যায়। বিজয়ীরা এ্যাসিরিয়ার জমিজমা ভাগ করে নেয়। পারস্য পড়ে মিডিয়ার ভাগে। অর্থাৎ পারস্য হল মিডিয়ার অধীন একটি রাজ্য।

পারস্য সাম্রাজ্যের জন্ম

এই অধীন রাজ্যের রাজা সাইরাস (কাইরাসও বলা হয়) খ্রীঃ পূঃ ৫৩৯ সনে ব্যাবিলন এবং প্রভু-রাজ্য মিডিয়া জয় করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর রাজ্য প্রসারিত হয় সমস্ত ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস অববাহিকায় এবং এশিয়া মাইনরে। সাইরাস একটা বুদ্ধির কাজ করেছিলেন। পরাজিত দেশের সংস্কৃতি, আচার আচরণের ব্যাপারে তিনি হাত দেননি। ব্যাবিলনে নজরবন্দী ইহুদিদের তিনি দেশে ফিরে যেতে দিলেন। (ইহুদিদের কথা একটু পরেই শুনবে)।

সাইরাসের ছেলে ছিলেন ক্যাম্বিসেস্। তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার ফলে রাজ্যে সৃষ্টি হয় অরাজকতা। তখন প্রধান অভিজাতরা দেরিয়াস্‌কে (দারায়ুস্‌ও বলে) সিংহাসনে বসালেন।

প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ফিনিসীয়া, মিসর, লিডিয়া, আরমেনিয়া, এ্যাসিরিয়া, ব্যাকট্রিয়া এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমানা জুড়ে দেরিয়াস্ এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কুড়িটি প্রদেশে বিভক্ত লক্ষ লক্ষ লোকের এতবড় সাম্রাজ্য এর আগে কোথাও হয়নি! (মানচিত্রে পারস্য সাম্রাজ্যের অবস্থান দেখে নাও)।

গ্রীক-পারসিক যুদ্ধ

এই বিশাল সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমানা গিয়ে ঠেকল গ্রীসের কাছে। গ্রীক উপনিবেশগুলিতে কার প্রাধান্য থাকবে, ভূমধ্যসাগরে কার নৌ-বহর এবং বাণিজ্যের একাধিপত্য থাকবে—এই প্রশ্নেই হল গ্রীক-পারসিক যুদ্ধ। পারস্য সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ পতন পর্যন্ত এই লড়াই চললো। একের পর এক পারস্য সম্রাট যুদ্ধ করে চললেন। (এই লড়াইয়ের কথা কিছু জানবে গ্রীস সম্বন্ধে আলোচনার সময়)।

কিন্তু আমরা তো সম্রাটদের চেয়েও পারস্যের সাধারণ মানুষের কথাই বেশী জানতে চাই! সে কথাই একটু শোন।

জরাথুস্ত্রের ধর্ম

পারসিক সম্রাটদের আমলে একজন ধর্ম সংস্কারকের মতামত খুবই প্রভাবশালী হয়েছিল। জরাথুস্ত্র ছিলেন সেই ধর্ম প্রচারক। জরাথুস্ত্রের জন্ম সম্বন্ধে অনেক লোকপ্রবাদ প্রচলিত ছিল। স্বর্গ থেকে আসা আলোর রশ্মি তাঁর মায়ের গর্ভে ঢুকেছিল, অর্থাৎ স্বর্গীয় দূত হিসেবেই জরাথুস্ত্রের জন্ম হয়। জন্মের পরেই তাঁর উচ্চহাসির শব্দে অপদেবতারা পালিয়ে যায়। তপস্যার জন্য তিনি চলে যান নির্জন পর্বতে। কত ভয়, কত প্রলোভন তাঁকে দেখানো হয়। কিন্তু সব কিছু জয় করে তিনি পেলেন সত্য জ্ঞান।

পরম ঈশ্বর এবং আলোক রাজ্যের প্রভু আহুর মাজদা তাঁর হাতে তুলে দিলেন সত্য জ্ঞানের খনি—"আবেস্তা"। সেই ধর্মই তিনি প্রচার করলেন। শেষে এক ঝলক আলো হয়েই তিনি স্বর্গে গেলেন।

জরাথুষ্ট্রের আগে মিডিয়া ও পারস্যের মানুষ সূর্য, পৃথিবী, ইন্দ্র, বায়ু ইত্যাদি অনেক দেবদেবীর পূজো করতেন। জরাথুষ্ট্র বললেন—"ঈশ্বর একজনই, অন্যান্য সব দেবদেবী তাঁর বিশেষ বিশেষ রূপ মাত্র।" এই একেশ্বর হলেন আলোক রাজ্য ও স্বর্গের প্রভু অগ্নিরূপী আহুর মাজদা। জরাথুষ্ট্রের বাণী রয়েছে ধর্মগ্রন্থ জেন্দ্ আবেস্তা'তে। (জেন্দ্ আবেস্তা'র অর্থ হল জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও সম্পূর্ণতা)

মহাপ্লাবন তত্ত্ব

ব্যাবিলনের ধর্মে বলা হয়েছিল মহাপ্লাবনের পরে স্বর্গের পরম পুরুষ একে একে আকাশ, জল, মাটি, তরুলতা, পশুপাখি এবং সবশেষে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। চীনেও ছিল এমনি মহাপ্লাবনের পরে নূতন সৃষ্টির কথা। জরাথুষ্ট্রও তেমন কথাই বলেছেন। বাইবেলে আছে 'নোয়া'র কাহিনী। হিন্দুধর্মেও আছে মহাপ্লাবনের জলে ভেসে রয়েছিলেন শুধু ভগবান বিষ্ণু এবং মানবের পূর্বপুরুষ 'মনু'।

সত্যি সত্যি ভারতের ঋকবেদ এবং লোক কাহিনীর সাথে জরাথুষ্ট্রের কাহিনীর অনেক মিল আছে। বেদ'এর মতই জরাথুষ্ট্রের ধর্মে ছিল আবেস্তা। তা ছাড়া লক্ষ্য করবে যে পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি সম্বন্ধে দেশে দেশে প্রায় একই রকম ভাবনা ছিল।

স্বর্গ-মর্ত্যে ভাল-মন্দের লড়াই

জরাথুষ্ট্র ধর্মের মূল কথা হল পৃথিবীতে ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ দুইই আছে। দুই শক্তির মধ্যে লড়াই চলে সব সময়। স্বর্গের রাজা আহুর মাজদা হলেন সবকিছু ভাল'র দেবতা। আহ্রিমান হলেন সবকিছু মন্দের রাজা। দুয়ের মধ্যে অনবরত লড়াইয়ের পরিণামে আহুর মাজদারই জয় হয়, যেমন হিন্দুধর্মে দেবতা ও অসুরের লড়াইয়ে দেবতাদেরই জয় হয়েছিল।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের লড়াই চলে সবসময়। যার মধ্যে ভালত্বের জয় হয়, সেই হয় প্রকৃত মানুষ। সে জন্যই আবেস্তা'তে বলা হয়েছে—"মানুষের কাজ হল শত্রুকে বন্ধু

করা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা, দয়া মায়া অনুশীলন করা, অজ্ঞানতা দূর করা।" মানুষের জীবনে আলোর কামনা করেছিলেন বলে আলোকের উৎস সূর্য তথা অগ্নিই জরাথুষ্ট্রের উপাস্য শক্তি।

নরকের শাস্তি, শয়তানের শয়তানী এবং পরাজয়—এসব কথা ইহুদি এবং খ্রীষ্টানদের ধর্মেও আছে। হিন্দু ধর্মেও আছে।

ভারতে 'পারসি' সম্প্রদায়

জরাথুষ্ট্র কখন জন্মেছিলেন সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। তবে একথা ঠিক যে সম্রাট দেরিয়াস্ এই ধর্মমত গ্রহণ করে পুরোহিতদের কাবু করেছিলেন। কিন্তু মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাস এবং আচার বিচার তো সহজে যায় না! রাজারা জরাথুষ্ট্রের ধর্মমতকে মানলেও তলে তলে অরুণ, বরুণ, মিত্র, মরুৎ, ইন্দ্রের উপাসনা চলতে থাকে। পারস্য সাম্রাজ্য পতনের পরে আবার পুরোহিতরা ক্ষমতাশালী হন। পারস্য উপসাগর পেরিয়ে একদল জরাথুষ্ট্রপন্থী ভারতে আশ্রয় নেন। আজও তাঁদের বংশধররা বোম্বাই অঞ্চলে আছেন। এরাই ভারতের জরাথুষ্ট্রপন্থী "পারসি"।

পারস্যের সম্রাট

শুধু ধর্মের কথা নিয়ে আমরা থাকতে চাই না। প্রথমেই বলছি পারস্যের আইন ও বিচারের কথা। সম্রাটের আদেশই ছিল আইন। (অবশ্য আহুর মাজদার নাম নিয়েই সব আইন জারি করা হত)। আইন না মানলে বেত মারা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নেওয়া, বিষ দিয়ে কিম্বা ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যার বিধি ছিল। সম্রাট ছাড়া আর ছয়টি পরিবারের হাতেই ছিল সব ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য।

স্থাপত্য শিল্পে পারসিকদের কৃতিত্ব

তবে পারস্যের মানুষ সাহিত্য এবং শিক্ষাদীক্ষায় উন্নতি করেছিলেন। পুরানো পারসিক ভাষা ছিল 'বেদ'-এর সংস্কৃত ভাষার মত। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ছিল আবেস্তা।

স্থাপত্যেই ছিল পারসিক সম্রাটদের সবচেয়ে বেশী আড়ম্বর। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে মাল মসলা এবং কারিগর যোগাড় করে সম্রাটরা বিরাট বিরাট প্রাসাদ বানিয়েছিলেন। রাজধানী পার্সিপোলিস' এর রাজপ্রাসাদটি ছিল ১ লক্ষ বর্গফুট জায়গা জুড়ে।

সম্রাট দেরিয়াসের লিপি থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে সুসা নগরের রাজপ্রাসাদের জন্য সেডার গাছ আনা হয়েছিল লেবানন থেকে, ওক্ গাছ গান্ধার থেকে। কারুকার্যের সোনা এসেছিল ব্যাকট্রিয়া থেকে, মূল্যবান পাথর আফগানিস্থান থেকে, হাতীর দাঁত ইথিওপিয়া ও সিন্ধু থেকে। পাথর কাটবার মিস্ত্রী আর সোনার কারিগর এসেছিল আইওনিয়া থেকে, দেয়ালে নক্সা করবার কারিগর মিডিয়া এবং মিসর থেকে, ইটের মজুর আইওনিয়া ও ব্যাবিলন থেকে। বুঝতেই পারছ—কিভাবে সমস্ত সাম্রাজ্যের সম্পদ কয়েকজন শাসকের ভোগবিলাসের জন্য অপচয় করা হয়েছিল।

আর্থিক জীবন

পারস্যের সম্পদ কি ভাবে আসতো? একটি পথ ছিল বাণিজ্য। সাম্রাজ্যের মধ্যে লম্বা লম্বা রাস্তা ধরেই দিকে দিকে ছড়ালো পারসিক পণ্য। ক্রমে ক্রমে আমদানি রপ্তানি বাড়ায় নৌবাহিনী হল। পারস্যের আসল সম্পদ অবশ্য আসতো কৃষি থেকে। কিন্তু সব জমিরই মালিক ছিলেন সম্রাট, অভিজাত এবং পুরোহিতরা। ভূমিদাস কিম্বা ভাগচাষীর অবস্থা ছিল প্রায় দাসদের মতই। খুব কম চাষীরই নিজস্ব জমি ছিল। চাষীদের উপর ছিল ট্যাক্স ও খাজনার বিশাল বোঝা। সব চেয়ে খারাপ অবস্থায় ছিল যুদ্ধবন্দী-দাসরা।

একদিকে অভিজাতদের আরাম-বিরাম খানাপিনা, অন্যদিকে অগণিত শোষিত মানুষ। এরকম সমাজ টিকে থাকতে পারেনা। ম্যাসিডনের দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডারের বাহিনীর আঘাতে পারসিক সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হল।

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে :—

১। পারস্য সাম্রাজ্যের বৃদ্ধি আর পতন হল সবাইকে অবাক করে।

২। কৃষক ও দাসদের বঞ্চিত করে পারস্যের জৌলুস ছিল নিতান্তই বাহ্যিক আড়ম্বর। ভিতরে ভিতরে শক্তি ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :

(ক) পারস্য অঞ্চলে কতদিন আগে পাথর যুগ ছিল ? (খ) "পারস্যুয়া" জায়গাটা কোথায় ? 'জেন্দ্ আবেস্তা' কথাটির অর্থ কি ?

করণীয় কাজ

পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে মহাপ্লাবন ও নূতন জীবন সম্বন্ধে যেসব গল্প আছে সেগুলি সুন্দর করে নিজের ভাষায় লিখবে।

পারস্য সম্বন্ধে পরীক্ষা

সময়—৩ ঘণ্টা ; মোট নম্বর—১০০

১। খুব সংক্ষেপে উত্তর দাও : ৬×৩=১৮

(ক) পারস্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ কি ধরনের ? (খ) কি ভাবে পারস্য মিডিয়ার অধীন হল ? (গ) পারস্য সাম্রাজ্যে কয়টি প্রদেশ ছিল ? (ঘ) "আহুর মাজদা" কাকে বলা হয়েছে ? (ঙ) অগ্নি উপাসক পারসিদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি।

২। চার-পাঁচ লাইনের মধ্যে উত্তর লেখ : ৬×১৩=৭৮

(ক) গ্রীক-পারসিক যুদ্ধের কি কি কারণ ছিল ? (খ) গল্পের আকারে জরাথুষ্ট্রের সত্যজ্ঞান লাভের কাহিনীটি লেখ। (গ) পারস্যে কৃষির মালিকানা কাদের হাতে ছিল ? (ঘ) ভাল-মন্দের লড়াই সম্বন্ধে জরাথুষ্ট্রের কথাগুলি লেখ। (ঙ) পারস্য সম্রাটরা প্রসাদ তৈরির জন্য যে আড়ম্বর করেছিলেন সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ। (চ) ভারতে একটি পারসি সম্প্রদায় কি করে সৃষ্টি হল ?

পরিচ্ছন্নতা—৪

(৪) প্যালেস্টাইনের হিব্রু সভ্যতা

অবস্থান : মানচিত্রে দেখবে মিসরের পুবে লোহিত সাগর ও সুয়েজের ওপারে প্যালেস্টাইন। অনেক পুরানো দিনেই ওখানে ছিলেন হিব্রু জাতি। তাঁদের ভাষাকেও বলে হিব্রু। তাঁদের প্রধান

দেবতা হলেন জেহোভা। যেখানে প্যালেস্টাইন, সেখানেই পাওয়া গেছে চল্লিশ হাজার বছরের পুরানো নরকংকাল। জেরিকো শহরের তলায় ছিল ব্রোঞ্জ যুগেরও আগেকার দেয়াল-ঘেরা লোকালয়।

কিন্তু প্যালেস্টাইন জায়গাটি হল মিসর থেকে এশিয়া মাইনরের পথে। মিসরের ফারাওরা এবং এ্যাসিরিয়া-ব্যাবিলন-পারস্যের রাজারা যখনই যুদ্ধ করেছেন, তখনই প্যালেস্টাইন হয়েছে লণ্ডভণ্ড।

ঐ জায়গাটিতে নদী নেই। তবুও ওখানকার মানুষ নিজেদের পরিশ্রমে গম, বার্লি, জলপাই, আঙ্গুর, খেজুর উৎপাদন করতেন অনেক। নিজেদের মধ্যে তাঁদের একতাও ছিল, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন আব্রাহাম ছিলেন তাঁদের সকলেরই পূর্বপুরুষ।

মিসরে দাস-জীবন ও মুসার কাহিনী

কিন্তু খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় সতেরশ' বছর আগে ভীষণ এক দুর্ভিক্ষের

মিশর থেকে ইহুদিদের পলায়নের পথ →
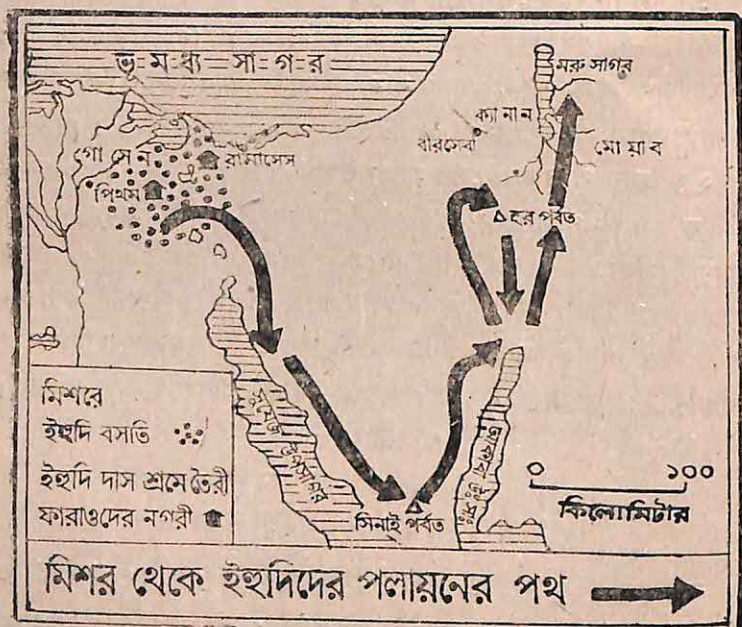
সময় প্যালেস্টাইনের অনেক মানুষ বাঁচার তাগিদে মিশরে আশ্রয় নেন। চারশ' বছরের বেশী সময় ধরে ফারাওদের দাসের মতই

রাস্তাঘাট, প্রাসাদ, নগর তৈরির জন্য শ্রমিক হিসেবে তাঁদের কাজ করতে হয়। কিন্তু কতদিন আর এই অবস্থা সহ্য হয়? মুসার নেতৃত্বে তাঁরা বিদ্রোহ করেন।

মিশরে ইহুদিদের চরম কষ্টের সময় দৈববাণী হয়েছিল যে ফারাও রাজ্যে ইহুদিদের ত্রাণকর্তার জন্ম হবে ইহুদির ঘরেই। ত্রাণকর্তা মুসার জন্ম হল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে শিশুটিকে রাণীই লালন-পালন করলেন। বড় হয়ে মুসা ফারাওয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। ইহুদিদের মুক্তি না দিলে মিসরের উপর ভগবানের যে সব অভিশাপ আসবে তেমন দশটি নমুনাও তিনি দেখালেন। ফারাওয়ের কাছে তিনি দাবি করলেন, "আমার লোকদের যেতে দিন"। ফারাও দমলেন না। তখন মুসার নেতৃত্বে ইহুদিরা সব কিছু ফেলে প্যালেস্টাইনের দিকে রওয়ানা হলেন। পিছনে ধাওয়া করল ফারাওয়ের সৈন্যরা।

সামনে পড়ল লোহিত সাগর। কিভাবে পার হওয়া যায়? সমুদ্রকে মুসা আদেশ করলেন, "আমাদের পথ করে দাও।" জল দুদিকে সরে গেল। মুসার লোকেরা পার হলেন। কিন্তু ফারাওয়ের সৈন্যরা ঐ পথে নামতেই জল আবার ধেয়ে এসে সবাইকে ভাসিয়ে নিল। আজও ইহুদিরা "অতিক্রমণ দিবস" পালন করেন।

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

সিনাই পর্বতের নীচে সকলকে রেখে ভগবানের নির্দেশ আনতে মুসা গেলেন পর্বতের চূড়ায়। বজ্রের শব্দ আর বিদ্যুৎ ঝলকের মধ্যে মুসা পেলেন ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা। সেই আজ্ঞাই তিনি প্রচার করলেন। সবগুলি আজ্ঞাই কিন্তু নৈতিক জীবন সম্বন্ধে, যেমন—হত্যা করা, চুরি করা, মিথ্যা বলা, হিংসা করা, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া হল পাপ। ভবিষ্যতের কথা না ভেবে সব শস্যই খরচ করবে না। পারিবারিক জীবন সুখের রাখবে। ভগবানের মূর্তি বানাবেনা। প্রতিবেশীকে ভালবাসবে। ইহুদিরা ঈশ্বরের প্রিয়। তাঁরা ভালভাবে চললে ঈশ্বর সহায় হবেন। (এই কাহিনী আছে বাইবেলে)।

যাই হোক, ইহুদিরা মিশর থেকে এসে সিনাই অঞ্চলে কিছুদিন আশ্রয় নিলেন। সেখান থেকে আবার রওয়ানা হলেন উত্তর দিকে। ক্যানান দখল করলেন। যশুয়ার নেতৃত্বে লড়াই করে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন প্যালেস্টাইনের রাজ্য। রাজধানী হল জেরুজালেম। মিসর থেকে প্যালেস্টাইনে আসবার পথটি মানচিত্রে দেখ)।

প্যালেস্টাইনের সম্পদ ও বিপদ

হিব্রু রাজ্যে তখন রাজা ছিলেন না। গোষ্ঠীপতিরাই শাসন করতেন। কিন্তু কালক্রমে সেখানেও রাজার শাসন কায়েম হল। প্রথম রাজা ছিলেন 'সল'। তাঁর ছেলে ডেভিডের বীরত্ব সম্বন্ধে বাইবেলে অনেক গল্প আছে। তার পরের রাজা ছিলেন সলোমন। সলোমনের আমলে দেশ হল সমৃদ্ধ। প্যালেস্টাইনের পথেই ফিনিসীয় বণিকরা বাণিজ্য করতেন। প্যালেস্টাইনের নৌবহর এবং নানা ধরনের শিল্প-কলাও দাঁড়াল। বড় বড় প্রাসাদ এবং জেহোভার মন্দির তৈরির মাল মসলা এল ফিনিসীয়া থেকে। দক্ষ কারিগর এল সিডন্ এবং টায়ার থেকে। দেড় লক্ষ শ্রমিক জোর করে যোগাড় করা হল নিজ দেশ থেকেই। কিন্তু এত সম্পদ ছিল বলেই ধনী-দরিদ্রের ভীষণ পার্থক্য হল। গৃহবিবাদ হল। একটি রাজ্য ভেঙ্গে দুটি রাজ্য হল। একের পর এক এ্যাসিরিয়া, মিশর, ব্যাবিলন দখল করল এই অঞ্চল। জেরুজালেমের প্রায় সব মানুষকেই ব্যাবিলনীয়রা বন্দী করে নিয়ে গেলেন। অবশেষে পারস্যের সম্রাট সাইরাস ব্যাবিলন দখল করে হিব্রু মানুষদের মুক্তি দিলেন।

প্যালেস্টাইন রাজ্যের উত্থান-পতন সত্ত্বেও পৃথিবীর সভ্যতায় হিব্রু জাতির দান অনেক। হিব্রু ভাষাতেই রয়েছে ইহুদিদের আইনবিধি, উপকথা, প্লাবনের কাহিনী, সৃষ্টির কাহিনী। বাইবেলের "ওল্ড টেস্টামেন্ট" মানব সভ্যতার এক মূল্যবান সম্পদ।

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে :

১। হিব্রু ভাষাভাষি হিব্রু জাতির অনেক ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছিল। তা সত্ত্বেও মানব সভ্যতায় তাঁদের দান কম নয়।

২। মুসার গল্পটি হল নির্বাসিত ইহুদিদের স্বাধীনতা-লড়াইয়ের কাহিনী।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :

(ক) প্যালেস্টাইন কোথায় অবস্থিত ? (খ) ইহুদিদের দেবতার নাম কি ? (গ) আব্রাহাম কে ছিলেন ?

করণীয় কাজ

মূসার জীবন কাহিনী নিয়ে একটি গল্প নিজের ভাষায় লিখবে।

প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে পরীক্ষা

সময়—২ ঘণ্টা ; মোট নম্বর—৫০

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও : ৩×৪=১২

(ক) কতদিন ধরে ইহুদিরা মিসরে নির্বাসিত জীবন কাটিয়েছিলেন ? (খ) তাঁদের মুক্তি আন্দোলনের নেতা ছিলেন কে ? (গ) প্যালেস্টাইন রাজ্যের অন্তত: তিনজন রাজার নাম বল। (ঘ) সলোমনের রাজত্ব বিখ্যাত কেন ?

২। প্রতিটির জন্য পাঁচ লাইন লিখে উত্তর দাও : ৩×৬=১৮

(ক) প্যালেস্টাইনের প্রধান কৃষিদ্রব্য কি কি ছিল ? (খ) কিভাবে ইহুদিদের মিসরীয় দাসত্ব হল ? (গ) মিসরে তাঁদের জীবন কি রকম ছিল ? (ঘ) দশ আজ্ঞা পাওয়ার কাহিনীটি লেখ। (ঙ) সলোমনের সময় প্যালেস্টাইনের সমৃদ্ধি বর্ণনা কর। (চ) সমৃদ্ধির কি বিষময় ফল হয়েছিল ?

৩। পুরো উত্তর লেখ : ১০×২=২০

(ক) মুসার কাহিনীটি লেখ। (খ) দশ আজ্ঞার ব্যাখ্যা কর।

(৫) গ্রীস' এর কথা

এতক্ষণ শুনেছ ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ এবং পুব পাড়ের কথা। এবার চল ভূমধ্যসাগরের উত্তর পাড়ে, গ্রীস' এ।

গ্রীস' এর অবস্থান

গ্রীস হল ইউরোপের পুব সীমানার একটি দেশ। এর দক্ষিণ অংশটা তিন দিকে সমুদ্রে ঘেরা। (মানচিত্রে মিলিয়ে দেখ)। পাহাড়ে জায়গা, বড় নদী নেই, বিস্তীর্ণ সমভূমিও নেই। গ্রীস আর এশিয়া মাইনরের মধ্যে ঈজিয়ান সাগরে লম্বা লাইনে রয়েছে অনেকগুলি দ্বীপ। মনে হয় যেন দ্বীপে দ্বীপে পা ফেলে গ্রীস থেকে এশিয়া মাইনরে পৌঁছানো যায়। দ্বীপ থেকে দ্বীপে যেতে হত বলে প্রাচীন কালেই গ্রাকরা হয়েছিলেন ভাল নাবিক। বাণিজ্যেও উন্নতি করেছিলেন। কিন্তু সমুদ্র আর পাহাড়ের বাধা থাকায় পুরানো দিনে সারা গ্রীস জুড়ে একটা রাজ্য হতে পারেনি। গ্রীসে সৃষ্টি হয়েছিল ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র।

গ্রীকরা আসবার আগেও ঐ জায়গায় মানুষ ছিলেন। তাঁদের কাবু করেই গ্রীকরা এই জায়গা দখল করেন। গ্রীকদের মধ্যে ছিল চারটি প্রধান গোষ্ঠি। (ডোরিয়ান, এয়োলিয়ান, একিয়ান এবং আইওনিয়ান)। তবে সব গ্রীকরাই নিজেদের বলেন "হেলেনীজ"।

কিংবদন্তী ছিল যে গ্রীকদের পূর্বপুরুষ ছিলেন "হেলেন।" এ জন্যই দেশের নাম "হেলাস", মানুষের পরিচয় "হেলেনীজ"।

ক্রীট সভ্যতার প্রভাব

মানচিত্রে দেখ গ্রীস থেকে দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরে রয়েছে একটি বড় দ্বীপ—ক্রীট। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেই ক্রীটে ছিলেন সভ্য মানুষ। এখানকার লোকেরা ধাতু ব্যবহার করতেন। শহরে জলসরবরাহ এবং জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও করেছিলেন। সুন্দর রাজপ্রাসাদ বানিয়েছিলেন। মৃৎশিল্প, অলংকার শিল্প, মূর্তিশিল্পে তাঁরা পটু ছিলেন। (ছবিতে তাঁদের শিল্পের নমুনা দেখ)। তাঁরা লিখতে পড়তেও পারতেন।

ক্রীটের শিল্প—ধাতুর তৈরী মাথার পিন

নৌবিদ্যা এবং বাণিজ্যেও পটু হয়েছিলেন। (মানচিত্রে দেখ তীরের

ফলা দিয়ে দেখানো রয়েছে ক্রীটের আমদানি রপ্তানির জায়গাগুলি)। গ্রীসের সঙ্গে বাণিজ্যের সাথে সাথে ক্রীট সভ্যতা এসেছিল গ্রীসে। ক্রীটের সুন্দর রাজধানী নোসাস্ খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ সনে ভূমিকম্পে একেবারেই ধ্বংস হয়। ক্রীটের গৌরবও শেষ হয়। (বর্তমান যুগে পৃথিবীর বহু দেশের প্রত্ন-তাত্ত্বিকরা একযোগে ক্রীটের পরিচয় উদ্ধার করেছেন)।

ক্রীটের শিল্প—নাগদেবী

ভূমধ্য সাগরের পুব পাড়ে ছিল ট্রয়। ট্রয়ের সাথে গ্রীসের যুদ্ধের কথাই রয়েছে গ্রীক মহাকাব্যে। কিন্তু ট্রয়ের প্রভাবও পড়েছিল গ্রীসের উপর। খ্রীঃ পূ ১৭০০ সনে ট্রয়ও ধ্বংস হয়। (প্রত্নতাত্ত্বিক এইচ্. স্লীম্যানের চেষ্টায় ট্রয়ের চিহ্নও মিলেছে মাটির তলা থেকে)। সে সময় মিসর ছিল সুসভ্য।
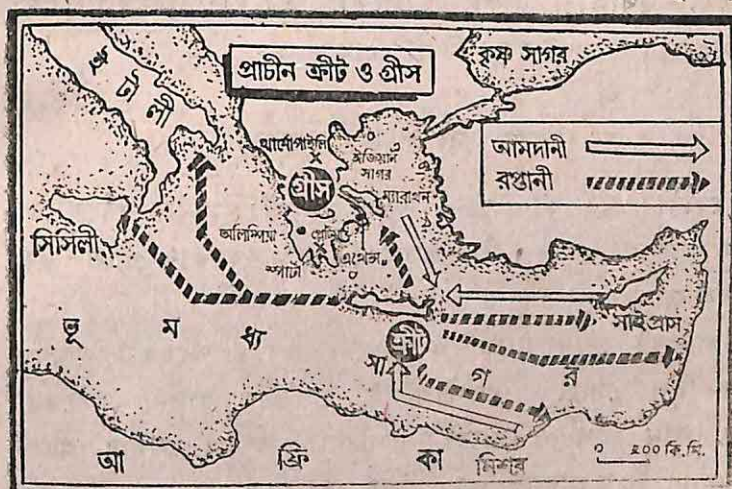
ফিনিসীয় ছিল বাণিজ্যে এবং লেখা ও লিপিতে পটু। খাস গ্রীসেও ছিল মাইসেনিয় সভ্যতা। এদের সংস্পর্শে গ্রীসও হয়েছিল এক উন্নত সংস্কৃতির দেশ।

মহাকাব্যের যুগে গ্রীস

মহাকবি হোমারের সময়কার গ্রীসের কথা জানতে পারি তাঁর মহাকাব্য থেকেই। মহাকাব্য দুটি হল ইলিয়াড এবং ওডিসী (ওডিসিয়ুস)। ইলিয়াডের গল্পটি খুব সংক্ষেপে শুনবে ?

ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের ছেলে প্যারিস এসে ছলেন লেসিডিমন (স্পার্টা) রাজ প্রাসাদে অতিথি হয়ে। দেশে যাওয়ার সময় তিনি রাণী হেলেনকে নিয়ে যান। গ্রীসের বিভিন্ন রাজ্য এক হয়ে আগামেমনন্, অকিলেস এবং ওডিসিয়ুসের নেতৃত্বে ট্রয় আক্রমণ করে। মহাবীর হেকটরের নেতৃত্বে ট্রয়বাসীরা তাঁদের বাধা দেন। গ্রীকরা দশ বছর চেষ্টা করে ট্রয়কে পরাজিত করেন। এই ঝাগড়ায় দুই পক্ষের বীরত্ব, জয় পরাজয় এবং সুখ দুঃখের নানা কাহিনী নিয়ে হল ইলিয়াড মহাকাব্য।

এই যুদ্ধের পরে নিজের দেশে ফিরে আসবার সময় বিচিত্র জায়গায় ইথাকা'র রাজা ইউলিসেস্' এর (ওডিসিয়ুস) বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণই হল ওডিসী মহাকাব্য।

মহাকাব্যে গ্রীস-এর পরিচয়

হোমার তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন খ্রীঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে। তাঁর মহাকাব্য থেকেই তাঁর আগেকার এবং তখনকার গ্রীসের কথা আমরা জানতে পারি।

প্রথমেই শোন সামাজিক জীবনের কথা। কয়েকটি পরিবার নিয়ে ছিল গোষ্ঠী। গোষ্ঠীপতিই গোষ্ঠীকে চালনা করতেন। তবে, জমি ছিল পরিবারের সম্পত্তি। তখনও লেখার প্রচলন ছিলনা। কিন্তু চারণরা এক দেশের কথা আর এক দেশে গান করে শোনাতেন।

তখনকার গ্রীকদের ধর্ম বিশ্বাসও ছিল বেশ সরল। তাঁরা অনেক দেবতায় বিশ্বাস করতেন। অবশ্য কয়েকজন দেবতাই ছিলেন প্রধান,

যেমন—বজ্র এবং আকাশের দেবতা জিউস্, সমুদ্রের দেবতা পসিডন্, সূর্য-দেবতা এ্যাপলো, শিল্পের এবং সাফল্যের দেবী এথেনা। গ্রীকরা ভাবতেন উত্তর গ্রীসের অলিম্পাস্ পর্বতেই দেবতারা থাকেন (যেমন হিন্দু দেবদেবীর অনেকেই থাকেন কৈলাস পর্বতে)। দেবতাদের খুশী করে গ্রীকরা নিজেদের সাফল্য কামনা করতেন। দেবতাদের আশীর্বাদের জন্য মানুষের খুব আগ্রহ ছিল বলেই দৈববাণীর খুব কদর ছিল।

গ্রীক দেবী এথেনা

মন্দিরের সেবায়েতের মুখ দিয়েই দেবতারা কথা বলতেন! ডেলফি'র এ্যাপলো মন্দির ছিল দৈববাণীর জন্য বিখ্যাত। সারা গ্রীস থেকে এখানে বহু মানুষের জমায়েত হত।

তখনকার গ্রীকদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি ও পশুপালন। তবে ধাতুর কাজ এবং মৃৎশিল্পের কাজও ছিল। জিনিসে জিনিসে বিনিময় করে লেনদেন হত।

গ্রীস-এর নগর রাষ্ট্র

ক্রমে ক্রমে পাশাপাশি একগুচ্ছ গ্রাম পরস্পরের সাথে মিশে তৈরি হল বড় জনপদ। দেয়াল দিয়ে ঘেরা হল। এই ভাবেই হল নগর। এক একটি নগরই হল এক একটি রাষ্ট্র। নগরের সবচেয়ে ভাল জায়গায় ছিল নগর কেন্দ্র—এ্যাক্রোপলিস্ অর্থাৎ নগর দুর্গ। রাজাই ছিলেন নগররাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতি, বিচারপতি এবং পুরোহিত। জনসাধারণের প্রকৃত ক্ষমতা তেমন কিছুই ছিলনা।

গ্রীকরা চার ভাগে বিভক্ত ছিলেন—(ক) অভিজাত—বেশীর ভাগ জমির মালিক এবং সবরকম সুবিধাভোগী, (খ) স্বাধীন নাগরিক—নিজেদের সামান্য জমিজমাই এঁরা চাষ করতেন, (গ) থীটস্—জমিহীন কৃষক যাঁরা অভিজাতদের জমিতে খাটতেন, এবং

(ঘ) দাস। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য বাড়বার ফলে সৃষ্টি হল বণিক-মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এঁরা শাসনের কাজে ভাগ পেলেন। গ্রীকরা অবশ্য একেই বলেছেন 'গণতন্ত্র'।

গ্রীক উপনিবেশ

গ্রীসের জমি কম। কিন্তু লোকসংখ্যা বাড়ল। অভিজাতদের অত্যাচারও আর সহ্য হল না। অনেক গ্রীক চলে গেলেন দেশের বাইরে। এশিয়া মাইনর, ঈজিয়ান সাগর, ইতালী, সিসিলী, স্পেন, মিসরে স্থাপন করলেন গ্রীক উপনিবেশ।

সাংস্কৃতিক মেলামেশা

মূল গ্রীসের সাথে উপনিবেশগুলির সহযোগিতা এবং সদ্ভাব ছিল। সকলেরই ভাষা ছিল গ্রীক। হোমারের মহাকাব্য ছিল সকলের প্রিয়। সকলেই ছিলেন একই দেবদেবীর ভক্ত। চারণরা সকলের গৌরবই গাইতেন এবং এক জায়গার খবর আর এক জায়গায় পৌঁছে দিতেন। ডেলফি'র মন্দিরে সব জায়গা থেকেই মানুষ জড়ো হতেন।

অলিম্পিক ক্রীড়া

নিজেদের সদ্ভাব বাড়িয়ে তুলবার জন্য তাঁরা অলিম্পিক খেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানের আদর্শ ছিল স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য শক্তি। প্রথম অলিম্পিক হয় এলিস নগরের অলিম্পিয়াতে, খ্রীঃ পূঃ ৭৭৬ সনে। তারপর প্রতি চতুর্থ বছরে দেবতা জিউসের সম্মানে এই অনুষ্ঠান হয়েছে।

সূচনা হয়েছিল লম্বা দৌড়ের প্রতিযোগিতা দিয়ে। কিছুদিনের মধ্যে চালু হল "পেণ্টাথ্‌লন" (অর্থাৎ লাফানো, ডিসকাস ছোড়া, বর্শা ছোড়া, ২০০ গজ দৌড়, কুস্তি)। তারপর ঘোড়দৌড় এবং নানা ধরনের শারীরিক কসরৎ। অলিম্পিকে শুধু খেলাধুলোই হত না। খোলা জায়গায় থিয়েটার, আবৃত্তি, আলোচনা সভা, পণ্ডিত ব্যক্তিদের বক্তৃতা এবং নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। মেলা বসত। জিউস উৎসবের পাঁচদিন বিভিন্ন রাজ্যে ছুটি থাকত। কোথাও

যুদ্ধ থাকলে সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধ রাখা হত। অলিম্পিক বিজয়ীদের মাথায় শুধু জলপাই পাতার মুকুট পরিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু নিজের দেশে ফিরে এলে তাঁরা পেতেন অজস্র পুরস্কার। আজও অলিম্পিক অনুষ্ঠান হয়। আজও রেডিওর খবরের জন্য তোমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাক—কখন শুনবে ভারত দু'একটা "সোনা" পেয়েছে!

কিন্তু অলিম্পিক সত্ত্বেও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ঝগড়াও ছিল। ঝগড়ার ফলে গ্রীক রাষ্ট্রগুলি দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। এক দলের নেতা হল স্পার্টা; আর এক দলের নেতা এথেন্স।

স্পার্টা

ডোরিয়ানরা গ্রীসের যে অঞ্চলে রাজ্য গড়েছিলেন তাকে বলে পেলপোনিসাস্। স্থানীয় মানুষদের কিংবদন্তীর পূর্বপুরুষ "পেলপস্"-এর নামেই হয়েছে জায়গাটির নাম। ওখানকার পুরানো লোকদের বলা হয় পেরিইসি। স্পার্টানদের সাথে পেরিইসির ঝগড়া লেগেই ছিল। স্পার্টায় ছিল আরো দুটি শ্রেণীর মানুষ। একটি ছিল হেলট শ্রেণী। এরা অভিজাতদের জমি চাষ করত, কিন্তু কোন রাজনৈতিক অধিকার পেত না। সবচেয়ে নীচে ছিল দাস শ্রেণী। জনসংখ্যার বেশীর ভাগই ছিল দাস। পেরিইসি ও দাসদের সম্বন্ধে স্পার্টানদের এতই ভয় ছিল যে অস্ত্র না নিয়ে তাঁরা ঘরের বাইরেই আসতেন না। এজন্যই বলা হয়—"দাস ব্যবস্থার ফলে স্পার্টানরাই ভয়ের দাস হয়েছিলেন।"

এথেন্স

খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় সাতশ' বছর আগে এথেন্সে চালু হয় অভিজাতদের শাসন। অভিজাতদের হাতেই ছিল বেশীর ভাগ জমি। মধ্যবিত্ত স্বাধীন চাষীকে বলা হত "ডেমোস"। তৃতীয় শ্রেণী ছিল বণিক ও কারিগরদের নিয়ে। এই তিনটি শ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার ছিল। দাসদের কোন অধিকারই ছিল না।

যাই হোক, স্পার্টা এবং এথেন্স হল গ্রীসের নেতা। দুয়ের মধ্যে রেষারেষিও ছিল। কিন্তু গ্রীকদের একটা গুণ ছিল। সমস্ত গ্রীসের

কাছে কোন বিপদ এলে সব রাষ্ট্র একজোট হয়ে দাঁড়াত। বিপদ চলে গেলে হয়তো আবার বিবাদ হত। গ্রীকরা সেরকম একটা ঐক্যবদ্ধ লড়াই করলেন পারস্যের বিরুদ্ধে।

গ্রীক-পারসিক যুদ্ধ

গ্রীসের মধ্যে স্পার্টা ও এথেন্স যখন বড় হয়ে উঠেছে, তখনই বড় হয়ে উঠেছে দেরিয়াসের পারস্য সাম্রাজ্য। ঐ সাম্রাজ্যের সীমানা এল ঈজিয়ান সাগর পর্যন্ত। এখানকার গ্রীক রাজ্যগুলির ভরসা ছিল এথেন্সের উপর। সুতরাং এথেন্সকে কাবু করতে না পারলে তো পারসিক সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে না!

পারস্য সম্রাট দেরিয়াস, জারক্সেস, আর্টাজারক্সেস্ প্রভৃতি খ্রীঃ পূঃ ৪৯১ সন থেকে ৪৭৯ সন পর্যন্ত লড়াই করলেন গ্রীকদের বিরুদ্ধে। স্পার্টা ও এথেন্স তখন এক সাথে দাঁড়াল। এই লড়াইয়ের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে আছে ম্যারাথনের যুদ্ধ। ৬০ হাজার পারসিক সৈন্যের বিরুদ্ধে ৯ হাজার এথেনীয় সৈন্য জয়লাভ করল। ফিডিপ্পাইডিস নামের এক দূত লম্বা দৌড়ে দেশে গিয়ে ঘোষণা করেন, "শুভ সংবাদ আমরা জিতেছি।" এই শেষ কথার পরেই অতিরিক্ত শ্রমে তাঁর মৃত্যু হয়। আজও "ম্যারাথন রেস" সেই দৌড়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। আর বিখ্যাত হয়ে আছে থার্মোপলির গিরিবর্ত্মে স্পার্টার রাজা লিয়োনিদাসের নেতৃত্বে স্পার্টান বাহিনীর অপূর্ব কীর্তি। বিশাল পারসিক বাহিনীকে রুখতে প্রতিটি স্পার্টান যোদ্ধা এখানে প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁদের স্মৃতিতে সেখানে লেখা হয়েছে, "হে পথিক! স্পার্টায় খবর দিও, তাঁদের আদেশ শিরোধার্য করে আমরা এখানে প্রাণ দিয়েছি"।

এর পরে জলযুদ্ধই হল বেশী। সালামিসের যুদ্ধে পারস্যের নৌ বহরের খুবই ক্ষতি হল। গ্রীস জয়ের আশা পারস্যকে ছাড়তে হল। গ্রীকদের দেশপ্রেম, বীরত্ব এবং এথেন্সের নেতৃত্বই গ্রীকদের সাফল্য আনলো। সারা গ্রীসে এথেন্সের সম্মান বাড়ল।

এথেন্স-স্পার্টার পেলপোনিসাস যুদ্ধ

পারসিক যুদ্ধের পরে কিন্তু এথেন্স ও স্পার্টার বন্ধুত্ব রইলনা। পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় গ্রীসের বিভিন্ন রাষ্ট্র একটা রাষ্ট্র-সংঘ গড়েছিল। ডেলোস দ্বীপে এই সংঘের কেন্দ্র ছিল বলে একে "ডেলোসের রাষ্ট্রসংঘ" বলে। এথেন্স ছিল এই সংঘের নেতা।

পেরিক্লিস-এর যুগে গ্রীস
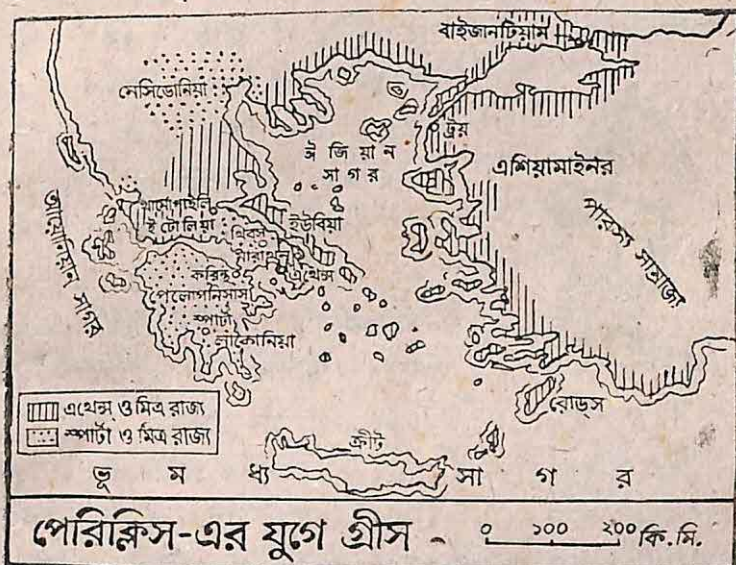
যুদ্ধের পরেও সংঘটি ভেঙ্গে না দিয়ে এথেন্সই কর্তৃত্ব করে চললো। সে সময় এথেন্সের সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন পেরিক্লিস। এ জন্যই এই সংঘকে বলা হয় পেরিক্লিসের নেতৃত্বে এথেন্সের সাম্রাজ্য।

কিন্তু স্বাধীনতা-প্রিয় গ্রীক রাজ্যগুলি কি এথেন্সের সাম্রাজ্যে পরিণত হবে? স্পার্টা কি এথেন্সের এই প্রাধান্য সহ্য করবে? তা ছাড়া বাণিজ্যের ঝগড়া তো ছিলই। এথেন্স ও স্পার্টার নেতৃত্বে সব গ্রীক রাজ্য দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। শুরু হল যুদ্ধ। এই যুদ্ধকেই বলা হয় পেলপোনিসাসের যুদ্ধ।

যুদ্ধ চলেছে খ্রীঃ পূঃ ৪৩১ থেকে ৪০৪ সন পর্যন্ত। এই যুদ্ধে এথেন্সই পরাজিত হয়। এথেন্সকে নৌবাহিনী এবং উপনিবেশ হারাতে হয়। এখানেই শেষ হল এথেন্সের গৌরব।

এথেন্সের স্বর্ণযুগ

পেলপোনিসাস্ যুদ্ধে এথেন্সের যে দুর্ভাগ্যই হয়ে থাক, পেরিক্লিসের সময় দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলায় এথেন্সে এসেছিল স্বর্ণযুগ। কথাতেই বলে "পেরিক্লিসের এথেন্স"।

পেরিক্লিস : পেরিক্লিস ছিলেন যানথিপাসের ছেলে। জেনো, এ্যানাক্সাগোরাস্ প্রভৃতি পণ্ডিতরা ছিলেন তাঁর শিক্ষক। তিনি ছিলেন দুর্নীতিমুক্ত, বিচক্ষণ, সুবক্তা। এক নাগাড়ে ৩০ বছর তিনি ছিলেন এথেন্সের একচ্ছত্র নেতা। পেরিক্লিসের নীতি ছিল এথেন্সে গণতান্ত্রিক শাসন আরও বাড়িয়ে তোলা, দরিদ্রদ্রের অন্ন, বস্ত্র, বিনামূল্যে আমোদ-প্রমোদ উপভোগের সুযোগ দেওয়া। অন্যদিকে তাঁর ইচ্ছা ছিল এথেন্সকে গ্রীক জগতের রাণী করে তোলা।

পেরিক্লিস

শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি সফলও হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন স্থপতি-ভাস্কর ফিডিয়াস্, ঐতিহাসিক হেরোডোটাস, নাট্যকার ইউরিপিদিস এবং সফোক্লেসের পৃষ্ঠপোষক। ঐতিহাসিক থুকিডাইডিস্ ছিলেন তাঁর সময়েরই লোক। এই সময়ে সবদিকেই এথেন্সের উন্নতি হয়েছিল বলে পেরিক্লিসের যুগকেই বলা হয় এথেন্সের স্বর্ণযুগ।

পেলপোনিসাস যুদ্ধ সুরু হওয়ার অল্পদিন পরেই এথেন্সে হল প্লেগ মহামারী। প্লেগেই পেরিক্লিসের মৃত্যু হয়। যুদ্ধে জয় পরাজয় যাই হোক, আজও সভ্য পৃথিবীর মানুষ পেরিক্লিসকে শ্রদ্ধা করেন।

গ্রীক সাহিত্য : হোমারের মহাকাব্য চর্চা হতো ঘরে ঘরে। অনেক কবি খণ্ড কবিতাও লিখেছেন। বীণা বাজিয়ে গীতিকাব্য গাওয়া হত। সাহিত্যের আর একটি দিক ছিল নাট্য সাহিত্য। সঙ্গীত এবং বাদ্য নিয়ে খোলা আকাশের নীচে অভিনয় হত। এসকাইলাস লিখেছিলেন "প্রমিথিউস্" এবং "পার্সিয়ানস্" নাটক।

সফোক্লেস ঃ এ সময়ের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন সফোক্লেস। নাটক প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন ২০ বার। অনুমান করা হয় তিনি ১৩০ খানা নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ৪ খানা পুরো পাওয়া গেছে। আন্তিগোনে, এলেকট্রা, অদিপাস্, টীরানাস, এ্যাজাক্স প্রভৃতি হল তাঁর বিখ্যাত নাটক। আজও সারা পৃথিবীতে সফোক্লেসের নাটক অভিনীত হয়, কলকাতাতেও হয়।

অন্যান্যদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ইউরিপিদিস। সাধারণ মানুষের দুঃখ নিয়ে তিনি নাটক লিখেছেন। আর ছিলেন এ্যারিষ্টোফেনিস্। হাসির নাটকে তিনি এথেন্সের নেতাদেরও বিদ্রূপ করেছেন।

ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস ঃ গ্রীস, মিসর এবং পারস্য সাম্রাজ্যের নানা জায়গায় ঘুরে হেরোডোটাস অভিজ্ঞতার বিবরণ তৈরি করেন। গ্রীক ভাষায় "ইস্টোরি" কথাটিতে বোঝাতো অনুসন্ধান এবং সত্যা-সত্য যাচাই। হেরোডোটাস বিভিন্ন খবর যোগাড় করে সাধ্যমত যাচাই করে নিয়েছিলেন। ভারত সম্পর্কেও তাঁর লেখায় কিছু উল্লেখ আছে। গ্রীক-পারস্য যুদ্ধ এবং ঐ সময়ের নানা ঘটনা নিয়েই লেখা হয়েছে তাঁর "ইতিহাস"। (ইতিহাস পড়বার সময় মনে রেখ হেরোডোটাসকেই বলা হয় "ইতিহাসের জনক")। এর অল্প পরেই ছিলেন আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তাঁর নাম থুকিডাইডিস। পেলপোনেসিয়ান যুদ্ধের ভুলভ্রান্তি বিচার করে তিনি লিখেছেন ঐ যুদ্ধের ইতিহাস।

হেরোডোটাস

সক্রেটিস ঃ সারা পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সক্রেটিসও এই যুগেই এথেন্সের উপকণ্ঠে জন্মেছিলেন। রাস্তায় বাজারে মানুষের সাথে তিনি নানা প্রশ্ন আলোচনা করতেন। তাদের ভুল ধারনা ভাঙ্গতেন। তাঁর সম্বন্ধে গ্রীক নেতা আলসিবিয়াডিস বলেছিলেন, "তাঁর স্বভাব এত সুন্দর—সোনার মত, স্বর্গীয়, এবং বিস্ময়জনক যে তিনি যা কিছু বলেন, সবই ঈশ্বরের বাণী মনে করে পালন করা উচিত"।

সক্রেটিসের ব্রত ছিল অসত্যের আবরণ খুলে দেওয়া। তিনি বলেছেন, "নিজেকে জানো। জ্ঞানই পুণ্য। সুতরাং সকলকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। শিক্ষার আলোতে অন্যায় পালিয়ে যাবে। সব কিছুই যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতে হবে।" অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে শাসকদেরও তিনি আক্রমণ করলেন। পেরিক্লিসের পরে যাঁরা এথেন্সের শাসক হয়েছিলেন, তাঁরা ভয় পেলেন। এ্যানিটাস তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে তিনি যুবকদের "বিপথ-গামী" করেছেন এবং রাষ্ট্রের ক্ষতি করেছেন।

সক্রেটিস

বিচারের সময় সক্রেটিস বললেন, "আমি সবাইকে বলেছি ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা না ভেবে আত্মার পবিত্রতার কথা ভাবতে।......আমার এই শিক্ষাই যদি যুবকদের বিপথে নিয়ে থাকে, তবে আমি অপরাধী" বিচারকরা সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। প্রথা অনুসারে বিষ পান করে তিনি মৃত্যু বরণ করলেন।

স্থাপত্য ভাস্কর্য ঃ গ্রীকদের চেষ্টায় চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত, বিশেষ

এথেনার মন্দির—পার্থেনন

ডিসকাস নিক্ষেপ

করে জ্যামিতির অনেক উন্নতি হয়েছিল। এথেন্সের সুদিনে দেবদেবীরও সুদিন এসেছিল। এথেনা, এ্যাপলো, ডেমেটার,

ডিওনিসাস্, জিউস্, প্লুটো, পসিডন, আর্টেমিস্, এ্যাফ্রোডাইট প্রভৃতির মন্দির হল দিকে দিকে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উন্নতি হল। মন্দিরের গর্ভগৃহ, মন্দিরের চারপাশে বড় বড় স্তম্ভ, মন্দিরের চূড়া তৈরি হল। শিল্পী ফিডিয়াস্ তৈরি করলেন হার্মিস্' এর মূর্তি এবং কাঠের উপর সোনা ও হাতীর দাঁতে মোড়া এথেনার মূর্তি। এলিস'-এর অলিম্পিয়াতে জিউস্'-এর মূর্তি গড়লেন তিনি। তাঁর তত্ত্বাবধানে মার্বেল পাথরে তৈরি হল এথেনার মন্দির 'পার্থেনন', তৈরি হল এথেন্সের এ্যাক্রোপলিস। মাইরনের তৈরি ডিস্কাস্ ছোড়ার মূর্তি আজও সবাইকে অবাক করে দেয়। হাতীর দাঁতের উপর সূক্ষ্ম চিত্র হল। ফুলদানি এবং বাটির গায়ে যে ছবি হল, তা দেখে ইংরেজ কবি কীটস্ ধন্য ধন্য করে কবিতা লিখেছেন।

ম্যাসিডন রাজ্য

শিল্প সাহিত্যের উন্নতি সত্ত্বেও গ্রীসে শান্তি এলনা। এথেন্সের পতনের পরে স্পার্টারও পতন ঘটল। কিন্তু মাথা উঁচু করে দাঁড়াল আর একটি গ্রীক রাজ্য—ম্যাসিডন।

ম্যাসিডন-রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ গড়ে তুললেন তাঁর বিখ্যাত "ফ্যালাংস" বাহিনী। এই বাহিনীর দক্ষ সৈনিকরা ১৬টি লাইনে দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা বর্শা নিয়ে শত্রুর সাথে সামনা সামনি লড়তো। আর সেই সুযোগে অন্যান্য অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী শত্রুকে ঘিরে ধরত। ফিলিপ খুব তাড়াতাড়ি গ্রীসের সবটাই জয় করেন। পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযানের ইচ্ছাও ঘোষণা করেন। কিন্তু অভিযানের আগেই তিনি মারা যান।

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার

ফিলিপের ছেলে আলেকজাণ্ডার ত্রিশ হাজার পদাতিক এবং পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে খ্রীঃ পূঃ ৩৩৪ সনে পারস্য অভিযানে বেরোলেন।

ইসাস'এর যুদ্ধে সম্রাট তৃতীয় দেরিয়াস্ পরাজিত হলেন। ঝড়ের বেগে আলেকজাণ্ডার জয় করলেন এশিয়া মাইনর, ফিনিসীয়া, সিরিয়া, মিসর। মিসরে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া নগর স্থাপন করলেন। গৌগামেলার যুদ্ধ জয়লাভ করে দখল করলেন সুসা, একবাটানা, ব্যাবিলন এবং পারস্যের রাজধানী পার্সিপলিস্। পারস্য সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হল।

আলেকজাণ্ডার

তারপর ব্যাকট্রিয়া, হেরাত, কাবুল জয় করে তিনি খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ সনে হিন্দুকুশ পার হলেন। ভারত সীমান্তে কিছু আদিবাসী পাহাড়ী গোষ্ঠী তাঁকে বাধা দিয়ে পরাজিত হল। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি তাঁর বশ্যতা মানলেন। পাঞ্জাবের রাজা পুরু তাঁকে বাধা দিলেন। কিন্তু পরাজিত হলেন। আলেকজাণ্ডার অবশ্য পুরুর সাথে বন্ধুত্ব করলেন। যুদ্ধে ক্লান্ত সৈন্যরা ভারতের মধ্যে আর ঢুকতে চাইলনা। ভারতের সীমানায় ও ভারতের মধ্যে জয় করা রাজ্যে তিনি শাসক নিয়োগ করে ফিরে গেলেন। ব্যাবিলনে পৌঁছে খ্রী: পূঃ ৩২৩ সনে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হল। (মানচিত্রে আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যটি দেখ)।

গ্রীক সাম্রাজ্যের প্রভাব

যেখানেই আলেকজাণ্ডারের বাহিনী পৌঁছেছে, সেখানেই গেছে গ্রীক সংস্কৃতি। ভারতেও এসেছে। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সাম্রাজ্য ভাগ করে সেনাপতিরা আলাদা আলাদা রাজ্য গড়লেন। টোলেমীর রাজত্বে আলেকজান্ড্রিয়াই হল জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। এখানেই কাজ করছেন ইউক্লিড, পিথাগোরাস, আর্কিমিডিস, টোলেমী এবং আরও অনেক মহাপণ্ডিত।

কিন্তু গ্রীসের তখন আর সামরিক শক্তি ছিলনা। ইতিমধ্যে

রোম বড় হয়ে উঠেছে। রোমের সাম্রাজ্য গ্রীসেও ছড়াল। খ্রীঃ পূঃ ১৪৭ সনে ম্যাসিডন হল রোমের পদানত। তারপর খ্রীঃ পূঃ ১৪৭ থেকে ৩০ সনের মধ্যে সারা গ্রীসই হল রোম সাম্রাজ্যের অংশ।
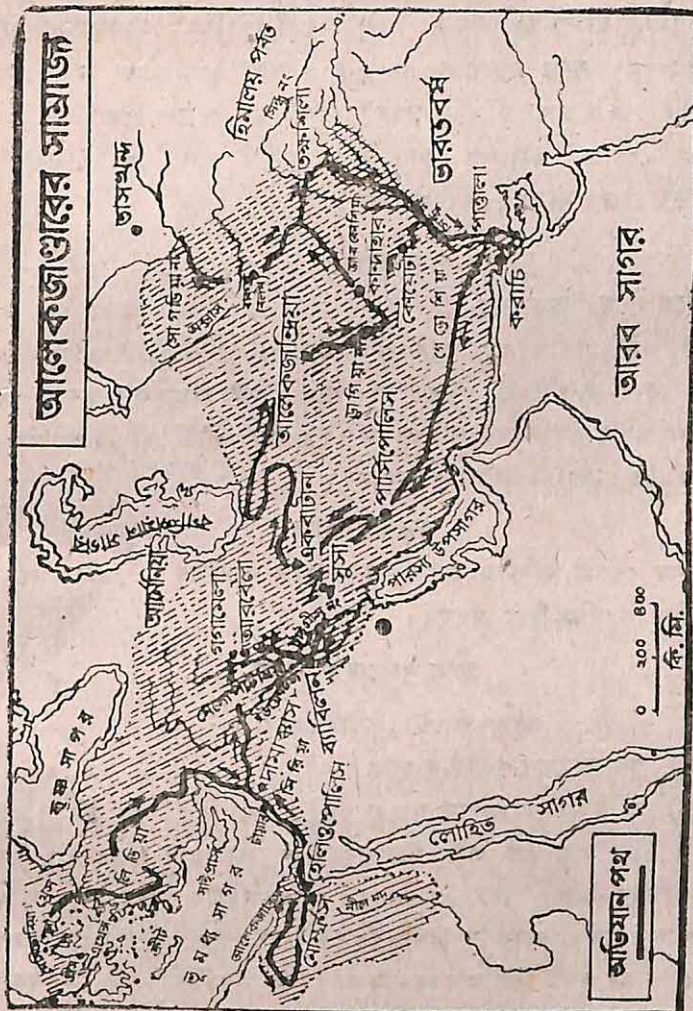
গ্রীসের কোন রাজার কোন রাজ্য জয়ই আমাদের কাছে মূল্যবান নয়। কিন্তু পৃথিবীর সাহিত্য সংস্কৃতি ভাস্কর্যে আড়াই হাজার বছর আগেই গ্রীস যা দিয়ে গেছে, সেটুকু মানব সভ্যতার বড় সম্পদ।

অনুশীলনী

নীচের তারিখগুলি মনে রাখবে (সবই খ্রীষ্ট পূর্ব) :—

গ্রীক-পারসিক যুদ্ধ ৪৯১—৪৭৯ সন : (ম্যারাথন যুদ্ধ ৪৯০ সন : থার্মোপলি এবং সালামিসের যুদ্ধ ৪৮০ সন) : ডেলোস স‌ংঘ ৪৭৭ সন : পেলপোনেসিয়ান যুদ্ধ ৪৩১—৪০৪ সন : সফোক্লিস ৪৯৬—৪০৬ সন : পেরিক্লিস ৪৯৫—৪২৯

যে নাটকে মানুষের জীবনে দুঃখের বিবরণ থাকে, তাকে বলে বিয়োগান্ত নাটক। যেখানে আনন্দের কথা থাকে, তাকে বলে মিলনান্ত নাটক। গ্রীসে দুই ধরনের নাটকই লেখা হয়েছিল।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :

(ক) ঈজিয়ান সাগরে অনেকগুলি দ্বীপ থাকায় প্রাচীন গ্রীসের কি সুবিধে হয়েছিল ? (খ) গ্রীসে বহু রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল কেন ? (গ) গ্রীকদের প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলির নাম বল। (ঘ) ক্রীট কোথায় অবস্থিত ? (ঙ) ক্রীটের রাজধানী কি ভাবে ধ্বংস হয় ?

করণীয় কাজ

বইয়ে দেওয়া মানচিত্র দেখে বড় কাগজে এথেন্সের ও স্পার্টার দলের রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন দিয়ে দেখাবে।

গ্রীস সম্বন্ধে পরীক্ষা

সময়=৩ ঘণ্টা ; মোট নম্বর=১০০

১। খুব সংক্ষেপে উত্তর দাও :— ১×১৭=১৭

(ক) ক্রীট সভ্যতা সম্পর্কে আমরা কতটুকু জেনেছি ? (খ) ট্রয় কোথায় অবস্থিত ছিল এবং কে এই সভ্যতার চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন ? (গ) চারণ কাদের বলে ? (ঘ) হোমারের মহাকাব্যদুটির নাম লেখ। (ঙ) অলিম্পাস সম্বন্ধে গ্রীকদের কি বিশ্বাস ছিল ? (চ) এ্যাক্রোপলিস কাকে বলে ? (ছ) মাইরনের একটি শিল্প কাজের নাম বল। (জ) দ্বিতীয় ফিলিপ কোথাকার রাজা ছিলেন ? (ঝ) অলিম্পিকের সূচনা কখন থেকে হয় ? (ঞ) পেণ্টাথ্‌লন কাকে বলে ? (ট) অলিম্পিকের উদ্দেশ্য কি ছিল এবং কি পুরস্কার দেওয়া হত ? (ঠ) সালামিসের যুদ্ধ কোন বছর হয়েছিল ? (ড) পেলপোনেসিয়ান যুদ্ধে কার পরাজয় হয়েছিল ? (ঢ) "ইস্টোরি" কথাটির অর্থ কী ? (ণ) গ্রীসের ৪ জন

বিখ্যাত নাট্যকারের নাম বল। (ত) ইতিহাসের জনক কাকে বলা হয়? (থ) পেলপোনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস কে লেখেন?

২। পাঁচ লাইন করে লিখে উত্তর দাও: ৪ × ৪ = ১৬

(ক) গ্রীকরা কোন কোন দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিলেন? গ্রীসে দৈববাণীর কদর ছিল কেন? (খ) কি ভাবে কখন এবং কেন গ্রীসের নগর রাষ্ট্র হয়? (গ) গ্রীকরা উপনিবেশ গড়ে ছিলেন কেন? (ঘ) কি কারণে এবং কি ভাবে গ্রীক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান হত?

৩। টীকা লেখ:— ৫ × ৮ = ৪০

(ক) মাইরণ। (খ) ফিডিয়াস। (গ) ম্যারাথন। (ঘ) থার্মোপলিতে গ্রীক বীরত্ব। (ঙ) পেরিক্লিস্। (চ) সক্রেটিস। (ছ) হেরোডাটাস। (জ) সফোক্লেস্।

৪। পুরো উত্তর লেখ:— ৮ × ৩ = ২৪

(ক) স্পার্টা এবং এথেন্সের সমাজে কি কি শ্রেণী ছিল? এথেন্সেও কি সত্যিকারের গণতন্ত্র ছিল? (খ) আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় কাহিনী সংক্ষেপে লেখ। (গ) এথেন্স-স্পার্টার বিবাদের কারণ এবং ফলাফল লেখ।

পরিচ্ছন্নতার জন্য = ৩

(৬) রোম'এর কথা

গ্রীস'এর পরে এল রোম'এর পালা। সে কথাই এবার শোন।

অবস্থান: মানচিত্রে দেখবে ভূমধ্য সাগরের মধ্যে লম্বা হয়ে নেমে গেছে ইতালী। ইতালীর উত্তর দিকে রয়েছে আল্পস্ পর্বত। অন্য তিনদিকে সমুদ্র। তার ফলে সমুদ্র পথে ইতালীয়রা বাণিজ্য করতে পেরেছেন পুবের সাথে, পশ্চিমের সাথে আর দক্ষিণে আফ্রিকার সাথে। দু' হাজার মাইল সমুদ্রতট থাকায় সমস্ত ভূমধ্য সাগরের উপর ইতালী খবরদারি করতে পেরেছিল।

প্রাচীনতা: 'রোম' এখনও ইতালীর রাজধানী। প্রায় তিন হাজার বছর আগে এখানেই সৃষ্টি হয়েছিল প্রাচীন রোমীয় সভ্যতা। তামা যুগের জিনিসপত্রও এখানে পাওয়া গেছে। আফ্রিকা, স্পেন, ফ্রান্স, গ্রীস থেকেও মানুষ এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। অবশ্য ল্যাটিন ভাষাভাষি ল্যাটিন গোষ্ঠীই ছিল রোমের প্রধান শক্তি।

রোম নগরের জন্মকথা ঃ রোম শহরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। রাজা নুমিটারকে খুন করে তাঁর ভাই সিংহাসনে বসলেন। নুমিটারের মেয়ে সিলভিয়ার দুটি শিশুপুত্রকেও হত্যার

রোমের স্থাপত্যে রোমুলাস ও রেমাস

ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু দৈবক্রমে এক মা-নেকড়ে নিজের দুধ দিয়ে ছেলে দুটিকে বাঁচিয়ে রাখে। পরে তাঁদের পালন করেন এক রাখাল। তাঁদের নাম হল রোমুলাস এবং রেমাস। বড় হয়ে এঁরা নুমিটারের হত্যাকারীকে সাজা দেন। এঁরাই রোম নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

সমুদ্র থেকে ১৫ মাইল দূরে, টাইবার নদীর পাড়ে, রোম শহরটি পাহাড় দিয়ে ঘেরা। নিরাপদ ছিল বলে অনেক লোক এসে রোমে বাসা বাঁধেন। খ্রীঃ পূঃ ৭৫৩ থেকে ৫১০ সনের মধ্যে ৭ জন রাজার রাজত্বে রোম রাজ্যটি বড় হয়। নানাদিকে বাণিজ্য ঘাঁটিও গড়ে ওঠে। কিন্তু অভিজাতরাই হলেন রোমের আসল প্রভু।

প্যাট্রিশিয়ান—প্লেবিয়ান বিবাদ

এই অভিজাতদেরই বলা হয় প্যাট্রিসিয়ান। এঁরা ছিলেন রোমের পুরানো ল্যাটিনদের বংশধর। সংখ্যায় কম। কিন্তু সব ক্ষমতাই ছিল এঁদের হাতে। ল্যাটিন বংশের নয়, এমন যে সব ইতালীয় রোমের বাসিন্দা হয়েছিলেন, তাঁরাই প্লেবিয়ান। সংখ্যায় বেশী হলেও তাঁদের অধিকার ছিল খুবই কম।

অত্যাচারী সপ্তম রাজা টারকুইনাস সুপারবাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে রোমে প্রজাতন্ত্র হল। সারা ইতালী জুড়েই হল রোমের প্রভুত্ব।

দাসের সংখ্যাও বাড়ল। কিন্তু নামেই প্রজাতন্ত্র। আসলে রোমে হল অভিজাততন্ত্র—প্যাট্রিসিয়ানদের শাসন।

প্লেবিয়ানদের মধ্যে ছিলেন শ্রমিক, ছোট কৃষক, ছোট ব্যবসায়ী, শিল্পী, কারিগর এবং সৈন্যরা। এঁরা ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। শাসন, বিচার এবং সরকারী কাজে এঁরা অংশ নিতে পারতেন না। চড়া সুদে ধার নিয়ে দেনার দায়ে সব কিছু খুইয়ে গরীব প্লেবিয়ানদের সমস্ত পরিবারকেই দাসত্ব মানতে হত। সৈন্যদের মধ্যে প্লেবিয়ানই ছিলেন বেশী। অথচ যুদ্ধে জয় করা জমির সবটাই প্যাট্রিসিয়ানরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিতেন।

প্লেবিয়ানরা কি চিরদিন এই অন্যায় সহ্য করবেন? খ্রীঃ পূঃ ৪৯৪-৪৯৩ সনে তাঁরা দল বেঁধে রোম ছেড়ে চলে যান। এই ঘটনাকে বলে প্রথম বিচ্ছেদ। কিন্তু এঁরা না থাকলে রোমের সম্পদ তৈরি করবে কে? সৈন্য আসবে কোথা থেকে? প্যাট্রিসিয়ানরা প্লেবিয়ানদের কিছু অধিকার মেনে নিয়ে আপস করলেন। প্যাট্রিসিয়ানদের ক্ষমতা কিন্তু কমল না। প্লেবিয়ানরা দ্বিতীয়বার রোম ছাড়লেন। ২০০ বছর আন্দোলনের ফলে ঋণ-দাস প্লেবিয়ানরা মুক্তি পেলেন। জমিতে এবং শাসনে তাঁদের অধিকার আদায় হল।

কিন্তু সব প্লেবিয়ানরা সমানভাবে এই সব সুবিধে পেলেন না। তাঁদের মধ্যেও তো ধনী-দরিদ্র্যের পার্থক্য ছিল! ধনী প্লেবিয়ানরা ভিড়লেন প্যাট্রিসিয়ানদের দলে। জমির দাবি মেটাতে গরীব প্লেবিয়ানদের পাঠানো হল নূতন উপনিবেশে।

নাগরিকতার বিবাদ

প্লেবিয়ান সমস্যার পরে এল রোমের নাগরিকতার সমস্যা। রোম রাজ্যটি বড় হওয়ায় যারা রোমের প্রজা হয়েছেন, তাঁরা শুধু অধিকারহীন 'প্রজাই' থাকবেন, কিম্বা নাগরিকের অধিকার তাঁরাও পাবেন? নাগরিক বলে স্বীকার না করায় এঁরা জমিতে ভাগ পেতেন না। সব কিছু ঝুঁকির কাজে এঁদেরই পাঠানো হত আগে। কিন্তু সেজন্যও কোন সুবিধে পেতেন না।

নাগরিকের অধিকার না দেওয়ায় ইতালীর অন্যান্য জায়গার মানুষরা রোমের উপর খুবই ক্ষেপে গিয়েছিলেন। হ্যানিবলকে হারিয়ে এবং পিউনিক যুদ্ধের বিপদ কাটিয়ে রোমানরা প্রতিশোধ নিতে লাগলেন। এমন আইনও পাস হল যে ইতালীয়দের নাগরিক অধিকার দেওয়ার সুপারিশ যিনি করবেন, তাঁকেই শাস্তি দেওয়া হবে। ইতালীয়রা অস্ত্র ধরলেন। সুরু হল "ইতালীয় যুদ্ধ"। একে সামাজিক যুদ্ধও বলে। ইতালীর জমিজমা, চাষবাস তছনছ হল। তিন লক্ষের বেশী লোক মরল। কিন্তু ইতালীয়দের নাগরিক অধিকার রোমকে একটু একটু করে মানতেই হল।

রোম ও কার্থেজ'এর পিউনিক যুদ্ধ

হ্যানিবল ছিলেন কার্থেজ'এর সেনাপতি। ভূমধ্যসাগরের পাড়ে, উত্তর আফ্রিকায়, ইতালীর ঠিক উল্টোদিকে ছিল কার্থেজ। ফিনিসীয় বণিকরা অনেকদিন আগেই এখানে একটা বাণিজ্য ঘাঁটি বানিয়েছিলেন। কালক্রমে কার্থেজ হয়েছিল স্বাধীন রাজ্য।

কার্থেজ'এর ছিল বিরাট নৌবহর আর বাণিজ্য। ভূমধ্যসাগরের উত্তরে ও দক্ষিণে রোম ও কার্থেজ। ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যে কার একাধিপত্য থাকবে? যুদ্ধ করেই মীমাংসা হল। রোম ও কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধ চললো খ্রীঃ পূঃ ২৬৪ সন থেকে ১৪৬ সন পর্যন্ত। "পিউনিকাস্" কথাটিতে বোঝাতো ফিনিসীয়া। এ জন্য এই যুদ্ধকে "পিউনিক যুদ্ধও" বলে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়—এই তিন পর্বে যুদ্ধ চলেছে। প্রথমবার নৌযুদ্ধই হল বেশী। রোমেরই জয় হল। কার্থেজ'এর সেনাপতি হ্যামিলকার বার্কা, তাঁর জামাই হাসড্রুবল এবং ছেলে হ্যানিবল তখন স্পেন থেকে রোম আক্রমণের ব্যবস্থা করলেন

কার্থেজের যুদ্ধ জাহাজের গলুই

সরাসরি রোমকে আঘাত করবার জন্য ২৬ বছর বয়সের কার্থেজ-সেনাপতি হ্যানিবল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আল্‌প্‌স্ পর্বত পেরিয়ে অসাধ্য সাধন করলেন। হাসড্রুবলও স্পেনে রোমীয় সেনাপতি সিপিওকে হারালেন।

মুদ্রায় হ্যানিবল

কিন্তু সিপিওর ২৪ বছরের ছেলে পাবলিয়াস সিপিও সোজা আফ্রিকায় এলেন। হ্যানিবল রোমের দরজা থেকে ছুটে এলেন। এই যুদ্ধে সিপিওরই জয় হল। **তিনি হলেন আফ্রিকানাস্ (আফ্রিকা বিজয়ী)।** কার্থেজের নৌবাহিনী এবং উপনিবেশ কেড়ে নেওয়া হল। দ্বিতীয় যুদ্ধে হেরেও ব্যবসা বাণিজ্য করে কার্থেজ আবার নিজের পায়ে দাঁড়াল। এমনটি কি রোম সহ্য করবে? তৃতীয় বার যুদ্ধ হল। বিজয়ী রোম কার্থেজ নগরীকে ধ্বংস করল। **পৃথিবীর মানচিত্র থেকে কার্থেজ মুছে গেল।**

রোম তখন "ভূমধ্যসাগরের রাণী"। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে রোমের প্রতিনিধিরা (কন্‌সাল্) শাসন করতে লাগলেন খুদে রাজার মত। অহংকারী রোম ইতালীয়দের বিরুদ্ধে সামাজিক যুদ্ধ বাধিয়ে দিল, একথা আগেই শুনেছ। কিন্তু পিউনিক যুদ্ধ এবং সামাজিক যুদ্ধে অসংখ্য মানুষ মরল। জমিজায়গা হল লণ্ডভণ্ড। অনেক গরীব কৃষক জমিজমা ছেড়ে শহরে ভিড় করলেন। সেইসব জমি গেল অভিজাতদের হাতে। ক্রীতদাস দিয়ে তাঁরা চাষ করালেন। প্রকাশ্য বাজারে দরকষাকষি করে দাস কেনাবেচা হল।

রোমের ধর্ম ও সমাজ

রোমের সাধারণ মানুষের কথা এখন একটু শোন। প্রত্যেক বাড়িতে গৃহস্থালির দেবী ভেসতা'র পূজো ছাড়াও রোমানরা অনেক দেবদেবীর পূজো করতেন। দেবরাজ জুপিটার দিতেন বৃষ্টি। তাঁর স্ত্রী জুনো নারীর সম্মান রাখতেন। (জুপিটার-জুনো অনেকটা হিন্দুদের ইন্দ্র-শচীর মত)। মারস্ ছিলেন রণদেবতা। মার্কিউরী ছিলেন স্বর্গ-

দেবরাজ জুপিটার

রাজ্যের দূত। রোমানদের সংস্কারও ছিল অনেক রকম। পশুপাখির আচরণকেও মানুষের ভাগ্যের পূর্বাভাস বলে ভাবতেন।

রোমের জীবন

প্রথম অবস্থায় রোমানরা ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। কৃষি এবং পশুপালনই ছিল প্রধান জীবিকা। মাটির বাসন, সাদাসিধে কাপড় এবং পশমের পোশাক নিজেরাই তৈরি করতেন। কিন্তু সাম্রাজ্য গড়বার সাথে সাথে তাঁদের জীবনও বদলে গেল। অভিজাতরা দখল করলেন বড় বড় জমিদারি। অঢেল সম্পদ এল বণিক এবং সুদখোরদের হাতে। উৎপাদনের কাজ পড়ল সবটাই ক্রীতদাসদের উপর। অভিজাতরা আরামে বিলাসে গা ভাসালেন। ভোজবাজি আর ভেল্‌কি, দড়ির খেলা আর ভাঁড়ামি হল তাঁদের মজার জিনিস। গ্ল্যাডিয়েটর যুদ্ধ হল আর এক রকমের বিশ্রী আনন্দ।

গ্ল্যাডিয়েটর যুদ্ধ

সার্কাসে লোহার জালের মধ্যে পোষা সিংহের মুখোমুখি খেলোয়াড় দেখলে নিশ্চয়ই তোমরা শিউরে ওঠ—যদি কিছু হয়! ভেবে দেখ, চারপাশের গ্যালারিতে বসে আছেন রোমের বিলাসপ্রিয় মানুষের দল। ক্ষুধার্ত সিংহের সাথে লড়াই করছেন এক মল্লবীর কিম্বা ক্রীতদাস। কখনো লড়াই হত দু'জন মল্লবীরের মধ্যেই। দর্শকরা চীৎকার করতেন, "মেরে ফেল, মরণ দেখতে চাই।'
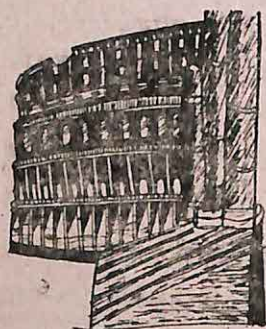
কলোসিয়াম (এক পাশ থেকে)

মল্লবীরদের বলা হত গ্ল্যাডিয়েটর।

লড়াইয়ের জায়গাকে ঘিরে বৃত্তের আকারে গ্যালারির মত করে থাকত দর্শকের আসন। একে বলত "এ্যাম্ফিথিয়েটার"। (৪৫ হাজার দর্শদের এ্যাম্ফিথিয়েটার 'কলোসিয়ামের' একটি ছবি দেখ আগের পৃষ্ঠায়)। নানা জায়গায় এরকম এ্যাম্ফিথিয়েটার তৈরি হল। মল্লবীর তৈরির আখড়া হল। গ্ল্যাডিয়েটর যুদ্ধ হল গরীবের পেশা, বড়লোকের ব্যবসা ও নেশা।

রোমের ক্রীতদাস, উপরে গলায় বেল্ট

সম্পদের বিষে রোমের সমাজে সৃষ্টি হল আলসেমি, বিলাসিতা, শোষণের রোগ। দাসদের ভাগ্যে জুটলো হাতে পায়ে বেড়ি, গলায় বেল্ট, সারাদিনের খাটুনির পরে অন্ধকার কুঠুরিতে বন্দীর মত রাত কাটানো! কাজ না করলে চাবুক কিম্বা ক্রুশে মৃত্যু। প্রত্যেকের গলায় বেল্টে লেখা থাকত "আমাকে আটকে রাখবেন, যেন পালাতে না পারি"। এই অবস্থায় এখানে ওখানে ছোটখাট দাস বিদ্রোহ হতে লাগল। মালিকদের চেতনা হলনা। তারপর? তারপর হল স্পার্টাকাস'এর বিদ্রোহ!

স্পার্টাকাস'এর কাহিনী

খ্রীঃ পূঃ ৭৩ সনে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে ৭৪ জন শিক্ষানবিস কাপুয়া'র এক গ্ল্যাডিয়েটর স্কুল ছেড়ে বেড়িয়ে এলেন। তাঁরা আশ্রয় নিলেন বিসুবিয়াস পর্বতের উপর। দেখতে দেখতে নানা দিক থেকে জড়ো হলেন পলাতক দাস এবং গ্ল্যাডিয়েটর। তৈরি হল স্পার্টাকাসের বিদ্রোহী বাহিনী। রোমের একটি বাহিনীকে হারিয়ে এঁরা পাহাড় থেকে নেমে সারা দক্ষিণ ইতালীতে ছড়িয়ে পড়লেন। দুটি বিদ্রোহী

বাহিনীর নেতা হলেন স্পার্টাকাস্ এবং ক্রিক্সাস্। একটা সময় এই বিদ্রোহে প্রায় সাত লক্ষ দাস যোগ দিয়েছিল।

স্পার্টাকাস্ বুঝলেন আরও রোমান বাহিনী আসবার আগে ইতালীর বাইরে চলে যেতে হবে। কিন্তু ক্রিক্সাসের বাহিনী দক্ষিণ ইতালীতেই জবরদখল কায়েমের চেষ্টা করে চললো। এই অবস্থায় রোমান সেনাপতি ক্রেসাস্ হারালেন ক্রিক্সাস্‌কে। স্পার্টাকাস্ আল্পস্ পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ক্রেসাসের কাছে পরাজিত এবং নিহত হলেন। বিদ্রোহীদের "শিক্ষা দেওয়ার" জন্য ছয় হাজার দাসকে খুন করে কাপুয়া থেকে রোমের রাস্তায় ঝুলিয়ে রাখা হল। রোমান সেনাপতি পম্পি এসে আরও কয়েক হাজার বিদ্রোহীকে খুন করলেন। দাস বিদ্রোহ ব্যর্থ হল। স্পার্টাকাস্ হারলেন। কিন্তু মুক্তির লড়াইতে মৃত্যুবরণ করে তিনি হলেন অমর।

প্রজাতন্ত্রের অবসান : সীজারের উত্থান

রোম বড় হয়েছিল উপনিবেশ জয় করে, বাণিজ্যের লড়াই করে, দাসদের দমন করে। এইসব ব্যাপারে যুদ্ধ তো করেছিল সৈন্যরাই। তার ফলে সেনাপতিরাই হলেন সবচেয়ে ক্ষমতাবান্। সব ক্ষমতাই তাঁরা সরাসরি দখল করতে চাইলেন।

সীজার, পম্পি এবং ক্রেসাস্ঃ—এই তিনজন সেনাপতি ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিলেন। কিন্তু ভাগের ক্ষমতায় কি সুখ আছে?

জুলিয়াস্ সীজার

সুরু হল গৃহযুদ্ধ। শেষ বিচার হল সীজার এবং পম্পির মধ্যে। বিজয়ী জুলিয়াস্ সীজার হলেন একনায়ক। রোম সাম্রাজ্যের সব জায়গাতেই শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি জয়ী হলেন। এশিয়ার উপনিবেশে এসে খুব সহজেই জয়লাভ করে তিনি বলেছিলেন, "আমি এসেছি, আমি দেখেছি, আমি জয় করেছি।" কিন্তু "প্রজাতন্ত্রী" রোমে কি একনায়কত্ব চলবে? সীজারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন তাঁরই বন্ধু ব্রুটাস্। খ্রীঃ পূঃ

৪৪ সনে বিরোধীরা সীজারকে হত্যা করলেন। হত্যার মুহূর্তে সীজার বলেছিলেন, "ব্রুটাস্, তুমিও!!"

গৃহযুদ্ধ আর গৃহযুদ্ধ

সীজারের ভক্তও কম ছিলেন না। এ্যাণ্টনি এবং অক্টাভিয়ান
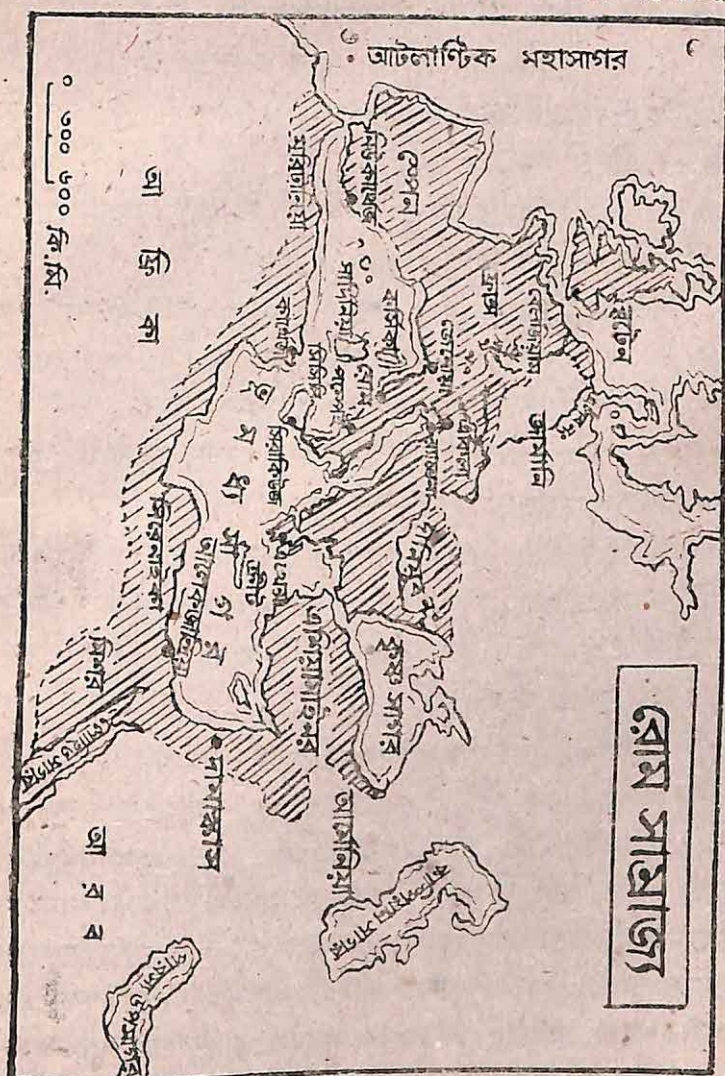
হলেন সীজারপন্থী দলের নেতা। বিরোধী দলের নেতা ছিলেন ব্রুটাস্ এবং ক্যাসিয়াস্। গৃহযুদ্ধে ব্রুটাসের দল সম্পূর্ণ হারল।

রইলেন এ্যাণ্টনি এবং অক্টাভিয়ান্। কিন্তু এক আকাশে কি দুই সূর্য থাকতে পারে ? আবার গৃহযুদ্ধ সুরু হল খ্রীঃ পূঃ ৩২ সনে। বিজয়ী অক্টাভিয়ানের নাম হল "অগাস্টাস্"। খ্রীঃ পূঃ ২২ সন থেকে তাঁকেই মাথায় নিয়ে সৃষ্টি হল রোম সাম্রাজ্য।

রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন

রোম সাম্রাজ্যের উত্থান কাহিনী তোমরা শুনলে। এই সাম্রাজ্য তখন বিশাল (মানচিত্রে দেখ)। ক্রমে ক্রমে সম্রাটরা স্বমূর্তি ধরলেন। বিলাসপ্রিয় সম্রাটদের দেহরক্ষী বাহিনী "প্রিটোরিয়ান গার্ডই" হল রোমের ভাগ্য বিধাতা।

কয়েকজন সম্রাটের কথা শোন। প্রথম ক্লডিয়াসের সময় ব্রীটেনের একটা অংশও ছিল রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে। সম্রাট নিরো ছিলেন চরম অত্যাচারী। মার্কাস অরেলিয়াস্ ছিলেন দার্শনিক। বাইজেন্টিয়ামে নূতন রাজধানী স্থাপন করলেন সম্রাট কনস্ট্যানটাইন। তিনিই রোম সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্মের পথ করে দিলেন।

কিন্তু পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দ থেকে উত্তর ইউরোপের বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী রোম সাম্রাজ্যে ঢুকতে থাকে। হূণ নেতা এ্যাটিলার বাহিনীও ঢুকে পড়ে ঝড়ের মত। এদের আঘাতে বিশাল রোম সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতই ভেঙ্গে পড়ল।

যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্ম

রোম সাম্রাজ্যের অধীনেই জেরুজালেমের কাছে বেথলেহেমের এক ইহুদি পরিবারে মেরীর গর্ভে যীশুর জন্ম হয়। সারা দুনিয়ার খ্রীষ্টানরা যীশুর জন্মদিন পালন করেন। ছোট ছোট সরল কথায়, নানা গল্পের উপমা দিয়ে তিনি তাঁর ধর্মমত প্রচার করলেন। কিন্তু তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচার করায় অভিজাতরা ক্ষেপলেন। প্যালেস্টাইনের রোমীয় শাসক পন্টিয়াস্ পাইলেটের আদেশে ক্রুশে বিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করা হল। (এজন্যই ক্রুশ হয়েছে খ্রীষ্টানদের কাছে পবিত্র চিহ্ন)। শুক্রবারে যীশুর মৃত্যু হয়েছিল। "গুডফ্রাইডে" হিসেবে

ঐ দিনটি পবিত্র। কথিত আছে তিনদিন পরে তিনি পুনর্জন্ম লাভ করেন। (এ জন্য ইস্টার মানডেও পবিত্র দিন)। পুনর্জন্মের পরে চল্লিশ দিন ধরে তিনি শিষ্যদের দেখা দিয়ে স্বর্গারোহণ করেন।

খ্রীষ্টধর্মের মূল কথা হল– ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে মানুষ যদি মনেপ্রাণে পবিত্র হয়, তবেই ঈশ্বরের শান্তিরাজ্য স্থাপিত হবে। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে ভালবাসেন। মানুষেরও কর্তব্য অন্যান্য মানুষকে ভালবেসে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করা। ঈশ্বরের কথা মানুষকে জানিয়ে তাঁকে উদ্ধার করবার জন্যই ঈশ্বরের সন্তান যীশু পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন। এই উদাহরণ থেকে মানুষ যেন শিক্ষা নেয়। বাইবেলের প্রথম অংশ "ওল্ড টেস্টামেন্ট"-এ আছে যীশুর জন্মের আগেকার কথা। দ্বিতীয় অংশ "নিউ টেস্টামেন্ট'-এ আছে যীশুর জীবনী, ধর্মমত এবং উপদেশ।

সভ্যতার ভাণ্ডারে রোমের দান

রোম সাম্রাজ্য নেই, সম্রাট নেই, সেনাপতিরা নেই, ক্রীতদাসদের প্রভুরাও নেই। কিন্তু রোমের দেওয়া অনেক কিছুই পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে আছে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগের জন্য যে সব রাস্তা হয়েছিল—(যার জন্য প্রবাদ রয়েছে 'সব রাস্তাই রোমে পৌঁছে দেয়'), যে সব বাণিজ্য-নগর সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলি আজও আছে। রোমের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন আজও আছে। ল্যাটিন লিপি ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে।
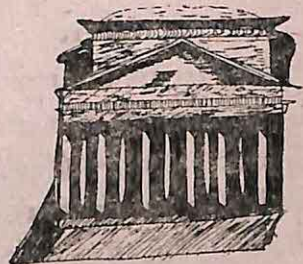
রোমের প্যানথিয়ন

ইট-পাথরের কংক্রীট তৈরির কৌশল, খিলান এবং গম্বুজের কারিগরি, জলের কৃত্রিম নালা ও জলের পাইপ—এসবই তো রোমের সাফল্য। রোমান দেবতাদের নামে উৎসর্গ করা প্যানথিয়ন এবং অসংখ্য প্রাচীন সৌধ আজও আছে। খারাপ কাজে ব্যবহার

করা হলেও এ্যাম্‌ফিথিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ আজও রোমানদের কারিগরি বিদ্যার পরিচয় দিচ্ছে।

রোম সাম্রাজ্য বেঁচে নেই। কিন্তু রোমের সাফল্য বেঁচে আছে পৃথিবীর সকল মানুষের সভ্যতায়।

অনুশীলনী

মনে রাখবে ঃ

১। প্যাট্রিসিয়ান-প্লেবিয়ান বিবাদ এবং সামাজিক যুদ্ধ হল রোমান অভিজাতদের অহংকার এব স্বার্থপরতার চিহ্ন

২। দাস শ্রমের উপর নির্ভর করে কোন রাজ্যই টিকতে পারে না।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :—

(ক) রোমের প্রাচীন অধিবাসীরা কোথা থেকে এসেছিলেন? (খ) "পিউনিক যুদ্ধ" বলা হয় কেন? (গ) "প্রথম বিচ্ছেদ" বলতে কি বোঝায়? (ঘ) এ্যাম্‌ফিথিয়েটার কাকে বলে?

করণীয় কাজ

রোম নগরী প্রতিষ্ঠার কাহিনীটি নিজের ভাষায় লিখবে।

"রোম" এর কথা থেকে পরীক্ষা

সময়—৩ ঘণ্টা; মোট নম্বর = ১০০

১। মুখে মুখে উত্তর দাও :— ৫ × ২ = ১০

(ক) রোমে কি প্রকৃত প্রজাতন্ত্র হয়েছিল? (খ) প্লেবিয়ান বলতে কাদের বোঝাতো? (গ) প্যাট্রিসিয়ান কাদের বলা হত? (ঘ) দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মনে করা হল কাদের? (ঙ) কয়টি পিউনিক যুদ্ধ হয়েছিল?

২। সংক্ষেপে উত্তর লেখ :— ৫ × ৪ = ২০

(ক) রোমের প্রাকৃতিক অবস্থান কি রকম? (খ) পিউনিক যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল? (গ) দেবদেবী সম্বন্ধে রোমীয়দের কি বিশ্বাস ছিল? (ঘ) কি ভাবে নাগরিকতার প্রশ্ন মিটেছিল? (ঙ) সেনাপতিরাই রোমে প্রাধান্য পেয়েছিলেন কেন?

৩। পুরো উত্তর লেখ :— ১০ × ৭ = ৭০

(ক) প্যাট্রিসিয়ান-প্লেবিয়ান বিবাদ হয়েছিল কেন? কি ভাবে এই বিবাদের মীমাংসা হয়? (খ) গ্ল্যাডিয়েটর যুদ্ধের একটি বিবরণ লেখ। (গ)

স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ কাহিনী সংক্ষেপে লেখ। (ঘ) কি ভাবে রোমে প্রজাতন্ত্রের বদলে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? (ঙ) রোমীয় অভিজাতদের এবং দাসদের জীবনযাত্রার বিবরণ দাও। (চ) পৃথিবীর সভ্যতায় রোমের কি দান আছে? (ছ) খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে ১০ লাইন লেখ।

(৭) কনফুসিয়াসের চীন

তোমরা জেনেছ চীন'এ সভ্যতার সূচনা হয়েছিল অনেক আগেই। কিভাবে সেই সভ্যতা আরও উন্নত হল, সে কথাই এখন শোন।

মহান সাঙ

চীনের হোনান প্রদেশের উত্তর দিকটায় মাটি খুঁড়ে উন্নত কৃষি-কাজের প্রমাণ মিলেছে। সেখানে ধান এবং গমও হত। জলসেচের সুব্যবস্থা ছিল। গরু, ভেড়া, শূয়োর, কুকুর ছিল গৃহপালিত পশু। ঘোড়ায় টানতো রথ। যুদ্ধের সময় হাতীও ব্যবহার করা হত। গুটি পোকা চাষ করে রেশম তৈরি করা হত। মাটির তলায় পাওয়া গেছে সুন্দর "চীনে মাটির" বাসন। ব্রোঞ্জের জিনিস দেখে বোঝা

সাঙ যুগে চীনের লিপি

যায় এখানকার কারিগররা বেশ দক্ষ ছিলেন। লিপির ব্যবহারও ছিল। রাজাদের কবর থেকে পাওয়া গেছে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাসন-পত্র, রথ, ঘোড়া এমন কি রথ চালকের কংকাল পর্যন্ত।

যে সংস্কৃতির কথা শুনলে, তার সৃষ্টি হয়েছিল ৩৬০০ বছর আগে, টিকেছিল ৬০০ বছর। সাঙ রাজবংশের নামানুসারে এই সংস্কৃতির নাম হয়েছে "মহান সাঙ"।

"চীন" সাম্রাজ্য

সাঙ রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ল। প্রতিবেশী "চৌ" রাজ্যের শাসকরা সাঙ রাজ্য দখল করে নিলেন। আশে পাশের অনেক ছোটখাট রাজ্যও তাঁরা দখল করলেন। পরাজিত কোন কোন রাজা চৌদের অনুগত হয়ে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে তিনটি রাজ্য

বেশ শক্তিশালী হল। এরা হল চু, চী এবং চীন। এই তিনটির মধ্যেও চীনরাই ছিলেন জবরদস্ত। তাঁরাই খ্রীঃ পূঃ ২৩০ সন থেকে ২২১ সন পর্যন্ত চেষ্টা করে একটা বড় সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

কনফুসিয়াস্

নানা রাজ্যে বিভক্ত হলেও চীনে কিন্তু জ্ঞানীগুণী লোকের অভাব ছিল না। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন লাও সে। তাঁর মতকে বলে "টাওবাদ"। স্বার্থপরতা ত্যাগ করে সরল জীবন যাপন করবার কথাই টাওবাদের মূল কথা। কিন্তু দু'হাজার বছর ধরে যিনি কোটি কোটি মানুষের শ্রদ্ধা পেয়েছেন, তাঁর নাম কনফুসিয়াস্।

কনফুসিয়াস্ (কাঙ ফু সে) জন্মেছিলেন এখনকার সান্টুং প্রদেশে। তিন বছর বয়সেই পিতৃহীন কনফুসিয়াস্কে উপার্জন করে বাঁচতে হয়। কিন্তু তিনি জ্ঞানের পথ ছাড়েননি। ২২ বছর বয়সে তিনি শিক্ষকতা সুরু করেন। মুখে মুখেই পড়াতেন। তিনি বলতেন, "তিন বছর পড়াশুনার পরে কেউ 'ভাল' না হয়ে পারে না।" কনফুসিয়াস্ কিন্তু স্বর্গ কিংবা ভগবানের কথা বলেননি। তাঁর কথা হল—বুদ্ধি, সাহস, সদিচ্ছার জোরেই মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়। সৎ চরিত্রের জন্য দরকার সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, বিনয়, ভালবাসা, ন্যায় ও সত্যের প্রতি নিষ্ঠা। পারিবারিক জীবন সুখী হয় বাবা, মা, সন্তানদের মধ্যে ভালবাসা দিয়ে। রাজা-প্রজার মধ্যে বোঝাপড়া দিয়েই ভাল শাসন হতে পারে। অত্যাচারী শাসক হল হিংস্র বাঘের চেয়েও খারাপ। রাজা যদি প্রকৃত রাজা, মন্ত্রী যদি প্রকৃত মন্ত্রী, পিতা যদি প্রকৃত পিতা এবং সন্তান যদি প্রকৃত সন্তান হয় তবেই সুখী সমাজ সম্ভব।

কনফুসিয়াস্

সুতরাং কনফুসিয়াসের উপদেশ হল 'মানুষ' হওয়ার জন্য আচার ব্যবহার অভ্যাসের কথা! কনফুসিয়াসের শিষ্যরা তাঁর কথাকে ধর্মোপদেশ মনে করেই সংকলন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে চীনের মানুষ তাঁকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করেছেন। তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে পরীক্ষা দিয়ে যাঁরা উত্তীর্ণ হতেন, তাঁরাই বড় বড় সরকারী চাকরি পেতেন।

চীনের প্রাচীর

'চীন'দের তৈরি সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট সি হুয়াঙ টি সারা রাজ্যে একই রকম আইন, একই রকম মুদ্রা, ওজন ও পরিমাপ এবং একই রকম লেখা চালু করলেন। ৭ লক্ষ বন্দী খাটিয়ে তিনি বিরাট রাজপ্রাসাদ এবং সুন্দর রাজধানী বানালেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি ছিল সপ্তম আশ্চর্যের একটি—চীনের প্রাচীর।

সাম্রাজ্যের উত্তর সীমানার বাইরে থেকে হানাদাররা মাঝে মাঝেই সাম্রাজ্যের মধ্যে লুটপাট করে চলে যেত। এদের রুখবার জন্য আগেই কিছু দুর্গ তৈরি ছিল। সম্রাট সি হুয়াঙ টি অনেক নূতন দুর্গ তৈরি
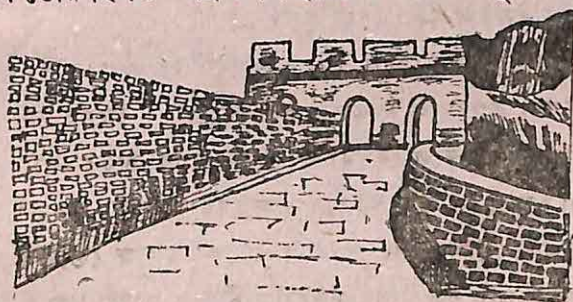
চীনের প্রাচীরের উপর দিয়ে রাস্তা

করে সবগুলি দুর্গকে একটা পাঁচিল দিয়ে যোগ করে দিলেন। এই ভাবেই হল চীনের প্রাচীর।

তিন লক্ষ শ্রমিক, অসংখ্য রাজনৈতিক বন্দী, বহু সংখ্যক দণ্ডিত অপরাধীকে এই কাজে লাগানো হয়েছিল। একটা সময় সাম্রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ মানুষই কোন না কোন ভাবে দেয়াল তৈরির কাজে লেগেছিলেন। তিন হাজার মাইল লম্বা দেয়ালের গড় উচ্চতা ২০

ফুট। দেয়ালটি এমন চওড়া যে ছয়টি ঘোড়সওয়ার দেয়ালের উপর পাশাপাশি ছুটতে পারত। দেয়ালের মধ্যেই ছিল বহু সৈন্যঘাঁটি। এর প্রতিটিতে ১০০ জন সৈন্য থাকতে পারত। এত জিনিস এই দেয়ালে লাগানো হয়েছিল যে তা দিয়ে বিষুবরেখা বরাবর পৃথিবীকে বেষ্টন করে ৮ ফুট উঁচু, ৩ ফুট পুরু দেয়াল হতে পারে। চীনের প্রাচীর হল পৃথিবীর একমাত্র জিনিস যাকে চাঁদ থেকে দেখা যায়। কিন্তু দেয়াল তৈরির জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অনটনে লোকের বিক্ষোভ হয়েছে। সি হুয়াঙ টি মারা গেলেন খ্রীঃ পূঃ ২০৬ সনে। খ্রীঃ পূঃ ২০২ সনেই হল বিদ্রোহ। ক্ষমতা দখল করল হান বংশ।

চীনের সমাজ ও সংস্কৃতি

"চীন" সাম্রাজ্যের সমাজে ছিল কয়েকটি শ্রেণী—বুদ্ধিজীবী, বণিক, কারিগর, কৃষক, দাস। সৈন্যদের তেমন কোন সামাজিক সম্মান ছিল না। যুদ্ধবন্দীদের দাস বানিয়ে রাস্তা-ঘাট তৈরির কাজে লাগানো হত, সৈন্যদলেও নেওয়া হত।

চৌ রাজাদের সময় থেকে চীনের প্রাচীন সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। কনফুসিয়াসের কথাগুলি সংকলন করা হয়েছে। বাঁশের চটার উপর নল দিয়ে লিখবার বদলে রেশমী কাপড়ের উপর উটের লোমের তুলি দিয়ে লেখা হয়েছে। তারপর হান রাজাদের আমলে, প্রথম খ্রীষ্টাব্দেই গাছের বাকল, বাঁশ এবং ন্যাকড়া থেকে কাগজ তৈরি হয়েছে। কাগজের আবিষ্কার হল মানব সভ্যতায় চীনের অমূল্য দান। বিজ্ঞান এবং কারিগরিতে চীন এসময় অনেক এগিয়েছিল। খাল, রাস্তা, প্রাচীর হল তার প্রমাণ। তাঁরা ভূমিকম্প পরিমাপের যন্ত্রও তৈরি করেছিলেন। হান রাজত্বের সময় থেকে নানা দিকে চীনের একটানা উন্নতি হয়েছে। মানুষের সভ্যতাও পরিপুষ্ট হয়েছে।

অনুশীলনী

বিশেষভাবে মনে রাখবে :

খ্রীঃ পূঃ ১৭৬৬—১১২৩ সাঙ বংশ। তারপর থেকে চৌ বংশ।

খ্রীঃ পূঃ ২২১ সনে সি হুয়াঙ টি কর্তৃক সাম্রাজ্য স্থাপন।

খ্রীঃ পূঃ ৬০৪— ৫১৭ লাও সে ঃ ৫৫১—৪৭৮ কনফুসিয়াস্।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

(ক) কোন বংশের রাজা প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন ?

(খ) চীনের সাম্রাজ্যে কয়টি শ্রেণী ছিল এবং কি কি ?

করণীয় কাজ

কনফুসিয়াসের মতামত সম্বন্ধে একটা ছোট প্রবন্ধ লিখবে।

চীন অংশ থেকে পরীক্ষা

সময় ৩ ঘণ্টা ঃ নম্বর—১০০

১। সংক্ষেপে উত্তর লেখ :— ৫ × ১২ = ৬০

(ক) মহান সাঙ বলা হয় কেন ? (খ) টাওবাদের মূল কথা কী ? (গ) সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য প্রথম সম্রাট কোন কোন পন্থা নিয়েছিলেন ? (ঘ) চৌ আমলে চীনের সাংস্কৃতিক উন্নতির পরিচয় কী ? (ঙ) দেয়ালের ফলে চীনের কি কি সুবিধা হয়েছিল ? (চ) কনফুসিয়াসের প্রভাব কিভাবে স্থায়ী হয়েছিল ?

২। পুরো উত্তর লেখ ঃ— ২০ × ২ = ৪০

(১) সাঙ যুগের কৃষি, পশুপালন ও কারিগরির কথা লেখ।

(২) চীনের প্রাচীর সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লেখ।

(৮) প্রাচীন ভারতের কথা

নানা দেশ বেড়িয়ে এখন নিশ্চয়ই নিজের দেশে ফিরে আসতে চাইছ !

আগেই তো জেনেছ খ্রীঃ পূঃ ১,৫০০ সনে হরপ্পা সভ্যতা ভেঙ্গে পড়েছিল। ঐ রকম সময়েই ব্যাকট্রিয়া এবং উত্তর ইরাণ থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন গিরিপথ দিয়ে, সিন্ধু অঞ্চল পেরিয়ে, ভারতের মধ্যে দলে দলে ঢুকে পড়েন নূতন এক গোষ্ঠীর মানুষ। এঁরাই ভারতীয় আর্য। গো-পালনই ছিল নূতন মানুষদের জীবিকা।

ঘাস-জমির খোঁজে ভারতে ঢুকে এঁরা দেখলেন এখানকার জমি তো বেশ ভাল! তাঁরা স্থায়ীভাবে রইলেন পাঞ্জাবে।

পুরানো দিনের এইসব আর্য গোষ্ঠীর কথা আমরা জানতে পেরেছি দু'হাজার বছরেরও আগে তাঁদেরই রচনা করা 'বেদ' থেকে। ১০২৮ শ্লোকের ঋকবেদে কোন ঘটনার বিশদ বিবরণ নেই। কিন্তু ঐ বেদ থেকেই সে সময়ে আর্যদের জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। তখন কিন্তু বেদ মুখস্থ করে রাখা হয়েছিল। অনেক পরে লেখা হয়েছে।

প্রথম দিকে যে সব আর্যরা এসেছিলেন, তাঁরা রইলেন পাঞ্জাব-দিল্লী অঞ্চলে। নূতন নূতন গোষ্ঠী গেল হিমাচলে, বিন্ধ্যপর্বতের দিকে এবং গঙ্গার পাড় ধরে উত্তর প্রদেশে। এখানে খুব ভাল জমি পাওয়া গেল। তবে আর গরুর পাল নিয়ে যাযাবরের মত ঘোরাঘুরি কেন? আগুন দিয়ে বন পুড়িয়ে চাষের জমি তৈরি করা হল। গো-পালনের বদলে কৃষিই হল তাঁদের প্রধান জীবিকা।

ঋকবেদ যখন রচনা করা হয় তখনো গরুই ছিল আর্যদের প্রধান সম্পত্তি। চুরি করলেও গরু, লুট করলেও গরু, শত্রু গোষ্ঠী থেকে কেড়ে নিলেও গরু। কিন্তু চাষবাস যখন সুরু হল, তখন লড়াই হল জমির দখল নিয়ে। দশ রাজার যুদ্ধে পশ্চিম পাঞ্জাবের ভরত গোষ্ঠীর রাজা সুদাস দশজন রাজার জোটকে হারিয়ে নিজের গোষ্ঠীর জমি-জমা এবং ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে নিলেন। জমির অধিকার নিয়ে আরো বড় রকমের লড়াইয়ের কথাই রয়েছে মহাভারতে।

"মহাভারত" মহাকাব্য: কুরুর বংশধররা কৌরব। পাণ্ডুর বংশধররা পাণ্ডব। এরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি। কিন্তু রাজ্য অর্থাৎ জমির অধিকার নিয়ে দু'দলের রক্তারক্তি হতে পারে মনে করে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যটিকে দু'ভাগ করে দিলেন। কৌরবদের রাজধানী হল হস্তিনাপুর। পাণ্ডবদের রাজধানী হল ইন্দ্রপ্রস্থ। (দুটো জায়গার চিহ্নই মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে)।

কিন্তু জমির ক্ষিধে কি সহজে মিটবে? কৌরবদের দলপতি

দুর্যোধন পাণ্ডবদের আগুনে পুড়িয়ে মারতে চাইলেন। তারপর পাশা খেলার পণে হারিয়ে বনবাসে পাঠালেন। পাণ্ডবদের সব জমিজমা কৌরবরা দখল করলেন। পাণ্ডবরা বনবাসের পরে আবার রাজ্য ফিরে চাইতেই লাগল যুদ্ধ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত সারা ভারতের রাজা আর গোষ্ঠীপতিরা দুই দলে ভাগ হয়ে যুদ্ধ করলেন। এই হল **কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ**। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনের নেতৃত্বে পাণ্ডবদেরই জয় হল। এই হল মহাভারত কাহিনী।

হয়তো কোন একটা ছোটখাট জমির বিবাদ নিয়েই তৈরি হয়েছিল মহাভারতের মূল গল্পটি। কিন্তু ঐ কাহিনীর সাথে আরো অনেক রকম গল্প জুড়ে মহাভারত হল দু'লক্ষ কুড়ি হাজার লাইনের এক মহাকাব্য। ব্যাসদেব নাকি এই মহাকাব্য সংকলন করেন। পণ্ডিতরা মহাভারতের বয়স ঠিক করেছেন খ্রীঃ পূঃ ৯০০ সন। মহাভারতের অনেক গল্পে দেখা যায় বনবাসের সময় পাণ্ডবরা অনেক পাহাড়ী রাজ্য, বুনো রাজ্য, অসুর ও রাক্ষস রাজ্য জয় করেছেন। এগুলি বিভিন্ন অনার্যগোষ্ঠীর রাজ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ অনার্যদের জয় করে আর্যরা নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করেছেন।

রামায়ণ মহাকাব্য ঃ রামায়ণের কাহিনী থেকেও একথা বোঝা যায়। রামায়ণ রচনা হয়েছে মহাভারত থেকে অন্ততঃ একশ' বছর পরে। ততদিনে আর্যরা ভাল জমির সন্ধানে গঙ্গার পাড় বরাবর অনেকটা পুব দিকে এসেছেন। এজন্যই রঘুবংশের রাজা দশরথের রাজধানী হল অযোধ্যায়।

পরিবারিক বিবাদের ফলে অযোধ্যার রাজা দশরথের ছেলে রাম, লক্ষ্মণ এবং রামের স্ত্রী সীতা গেলেন বনবাসে। সে সময় তাঁদের সাথে বিবাদ হল লঙ্কার রাজা রাবণের। সীতাকে চুরি করে লঙ্কায় নিয়ে গেলেন রাবণ। তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য সমস্ত দাক্ষিণাত্য অতিক্রম করে রাম গেলেন লঙ্কায়। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন গোষ্ঠীর মানুষ রামের শত্রুতা করল এবং যুদ্ধে পরাজিত হল। কোন কোন গোষ্ঠী তাঁর বশ্যতা মেনে নিল। যাই হোক, সীতাকে উদ্ধার

করে বিজয়ীরা অযোধ্যায় নিয়ে এলেন। রামই হলেন অযোধ্যার রাজা। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ন্যায় ও শান্তির রাজ্য।

উত্তর ভারত থেকে আর্যরা যেভাবে দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধ জয় করলেন এবং দক্ষিণের লোকদের যেভাবে বুনো এবং রাক্ষস বলে উল্লেখ করলেন, তা থেকেই বোঝা যায় রামায়ণের কাহিনীতেও রয়েছে অনার্যদের উপর আর্যদের প্রভুত্ব স্থাপনের কথা। মহাভারত রচনার সাথে ব্যাসদেবের নাম জড়িত। রামায়ণ রচনার সাথে তেমনি রয়েছে ঋষি বাল্মিকীর নাম।

এই রকম দু'একটা বড় যুদ্ধেই কিন্তু সব কিছু মিটে যায়নি। আর্য-অনার্যের বিবাদ চলেছে অনেকদিন। আর্যরা নিজেদের ধর্ম, ভাষা, আচার, অনুষ্ঠান অনুসরণ করেছেন। কালো রংয়ের অনার্যদের তাঁরা ঘৃণা করেছেন। কিন্তু আর্য-অনার্যদের মেলামেশা না হয়ে তো যায়নি। তার ফলে অনার্যদের ধর্ম, আচার অনুষ্ঠানও আর্যরা অনেকটা গ্রহণ করেছেন। আর্য-অনার্য ধর্ম-সংস্কৃতি মিশে তৈরি হয়েছে ভারতের সংস্কৃতি।

বৈদিক ভারতে রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম

ঋক ছাড়াও প্রাচীন আর্যরা সাম, যজু, অথর্ববেদ এবং বেদাঙ্গ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদও রচনা করেছিলেন। এই সব রচনা থেকেই সেই যুগের কথা জানতে পারি।

রাষ্ট্রজীবন ঃ আর্যদের গোষ্ঠীর নেতাই হতেন "রাজা"। পুরোহিতরা ঘোষণা করলেন "রাজা হচ্ছেন দেবতাদের নির্বাচিত"। এর ফলে রাজার প্রতিপত্তি বাড়ল। পুরোহিত আর রাজা গাঁটছড়া বাঁধলেন। এক একটা গোষ্ঠীর মানুষকে বলা হত "জন"। জনের অংশকে বিশ; বিশের অংশকে গ্রাম। গ্রামের কর্তা ছিলেন গ্রামণী। গ্রাম হল কতগুলি জ্ঞাতি পরিবার নিয়ে।

আর্থিক জীবন ঃ প্রথমে জমি ছিল গ্রামেরই সম্পত্তি। পরে হল পরিবারের এবং সব শেষে ব্যক্তিগত। সূত্রধর, কুম্ভকার, চর্মকার,

কর্মকার, তন্তবায় প্রভৃতি কথা থেকেই বোঝা যায় সে সময় অনেক রকম কারিগরির কাজ চালু হয়েছিল। ব্যবসা বাণিজ্যও চলেছিল।

সমাজ জীবন : আর্যদের মধ্যে প্রথমে ছিল তিনটি বিভাগ—যোদ্ধা (অভিজাত শ্রেণী), পুরোহিত, সাধারণ মানুষ। এদের মধ্যে মেলামেশা, খাওয়াদাওয়ায় বাধা ছিল না। কিন্তু কালো রংয়ের (বর্ণের) অনার্যদের এরা সকলেই হীন এবং দাস মনে করে ঘৃণা করতেন। এইভাবে আর্য-অনার্যের গায়ের "বর্ণে" পার্থক্য নিয়েই শুরু হল বর্ণভেদ। রাজন্য, ব্রাহ্মণ এবং কৃষিজীবী বৈশ্যরা হলেন উচ্চবর্ণ 'দ্বিজ'। সবচেয়ে নীচে রইল শূদ্র। নানা ধরনের পেশা ও বৃত্তি চালু হওয়ায় এক এক দল লোক একরকম বৃত্তি নিলেন। এইভাবে অনেক উপবর্ণ সৃষ্টি হল। বর্ণবিভাগে যাঁদের সুবিধে হল তাঁরা একে "ভগবানের বিধান" বলে প্রচার করলেন। ইতিমধ্যে যাগযজ্ঞ পরিচালনা করে ব্রাহ্মণরা নিজেদের জায়গা করে নিলেন সমাজের মাথায়। তখন বর্ণবিভাগ হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং সবচেয়ে নীচে শূদ্র। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনকেও ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চার পর্যায়ের ছকে বেঁধে দিলেন। একেই বলে **চতুরাশ্রম**।

ধর্ম জীবন : কৃষিজীবী আর্যরা কৃষির সহায়ক প্রাকৃতিক শক্তি—ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, বরুণ, মরুৎ প্রভৃতিকে যাগযজ্ঞ ও আহুতি দিয়ে পূজো করতেন। যজ্ঞের আড়ম্বর যত বাড়ল, পুরোহিতের ক্ষমতাও ততোই বাড়ল। ব্রাহ্মণরা তখন স্বর্গ-নরক এবং কর্মফল অনুসারে পুনর্জন্মের কথা বললেন। শূদ্রদের দাসত্ব এবং অস্পৃশ্যতাও পূর্বজন্মের কর্মফল বলেই তাঁরা প্রচার করলেন।

কিন্তু শূদ্রদের সাথে মেলামেশা না করেও তাঁরা পারলেন না। অনার্যদের দেবতা শিবকেও আর্যরা দেবতা বলে স্বীকার করলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব হলেন দেবতাদের মধ্যে তিন-প্রধান। ইতিমধ্যে শিল্প-কারিগরি এবং ব্যবসা বাণিজ্য বেড়েছে। বণিক ও শ্রেষ্ঠীরা হয়েছেন অর্থবান। অথচ বেদ ও বর্ণভেদের দোহাই দিয়ে ব্রাহ্মণরা এদের কোন প্রতিপত্তি মানেনি। তখন বেদ-ব্রাহ্মণকে অস্বীকার

করে নূতন ধর্মপথের সন্ধান হতে লাগল। এই সন্ধানের ফলই জৈন ও বৌদ্ধধর্ম।

জৈনধর্ম ও মহাবীর ঃ জৈনধর্মের প্রবর্তক ছিলেন বর্দ্ধমান (মহাবীর)। এক ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীতে তাঁর জন্ম হয়। সংসার ছেড়ে অনেক বছর তপস্যার পরে তিনি হলেন 'জিন' ('সত্যজ্ঞানী')। এজন্যই তাঁর ধর্মমতকে বলা হল "জৈন ধর্ম"।

মহাবীর বলেছেন সব কিছুরই আত্মা আছে। সুতরাং প্রকৃত জৈনকে সম্পূর্ণ অহিংস হতে হবে। সৎ বিশ্বাস, সৎ জ্ঞান, সৎ চিন্তা এবং সৎ চরিত্রই শান্তি এবং মুক্তি দিতে পারে।

গৌতমবুদ্ধ

মহাবীর

বৌদ্ধধর্ম ও গৌতমবুদ্ধ ঃ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতমও (সিদ্ধার্থ) জন্মেছিলেন শাক্য নামের ক্ষত্রিয় বংশে। তিনি সংসার ছেড়ে তপস্যা করে "বোধি" অর্থাৎ পরম জ্ঞান পেলেন। এ থেকেই তাঁর ধর্মের নাম হল বৌদ্ধধর্ম।

বুদ্ধদেব বলেছেন এই জগতে দুঃখ আছে, কারণ আকাঙ্ক্ষা আছে। আবার আকাঙ্ক্ষা জয় করে নির্বাণের (মুক্তি) পথও আছে।

শিষ্যদের নৈতিক জীবন উন্নত করবার জন্য তিনি কতকগুলি "শীল" এবং আচরণ বিধির কথা বলেছেন। একেই বলে "অষ্টাঙ্গিক মার্গ"। মহাবীর এবং গৌতমবুদ্ধ— দুজনেই জন্মেছিলেন খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে। দুজনেই যাগযজ্ঞ, বলি, বেদ-ব্রাহ্মণের বিরোধিতা করেছেন। সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষাতেই বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচার করেছেন। এই দুটি ধর্মে বর্ণভেদের কথা ছিল না। কিছু ক্ষত্রিয়, অনেক বৈশ্য এবং শূদ্র দলে দলে এই দুটি ধর্ম গ্রহণ করলেন।

প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্য

ষষ্ঠ শতকেই ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের প্রথম ইঙ্গিত এসেছিল। ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি ভেঙেচুড়ে হয়েছিল ষোলটি "মহাজনপদ"। এদের মধ্যে কাশী, কোশল, বৃজি এবং মগধই ছিল শক্তিশালী। মগধের রাজা বিম্বিসার এবং তাঁর ছেলে অজাতশত্রু অন্য সবগুলি জনপদ জয় করে মগধে এক বিরাট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যের রাজধানী প্রথমে ছিল রাজগীর, পরে হল পাটলিপুত্র। দু'শ বছর পরে মগধ রাজ্য আরো অনেক বড় হল। স্থাপিত হল মৌর্য সাম্রাজ্য। মৌর্য বংশের চন্দ্রগুপ্ত হলেন প্রথম সম্রাট।

চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব ভারত থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করলেন। জয় করলেন দাক্ষিণাত্যের অনেকখানিই। খ্রীঃ পূঃ ৩০৫ থেকে ৩০৩ সন পর্যন্ত সময়ে সেলুকসের গ্রীক বাহিনীর সাথে লড়াই করেও কাবুল কান্দাহারে সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে নিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত'র ছেলে বিন্দুসার কর্ণাটক পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের প্রায় সবটাই জয় করেন। তাঁর ছেলে সম্রাট অশোক জয় করেন কলিঙ্গ। দক্ষিণ ভারতের একেবারে শেষ সীমানার কেরল এবং তামিল রাজ্যগুলি তিনি জয় করেননি। তবে ঐ রাজ্যগুলি এবং সিংহল ছিল বন্ধুভাবাপন্ন রাজ্য। সুতরাং অশোকের সময় সারা ভারত জুড়েই মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, একথা বলা চলে। (মানচিত্রে দেখ)। অশোক আর যুদ্ধ করেননি। কিন্তু শান্তির নীতিতে তিনি বিদেশের মনও 'জয়' করেছিলেন।

এই সাম্রাজ্যের প্রধান শক্তি ছিল কৃষি। চাষ করতো শূদ্ররা। কৃষি, খনি এবং অনেক কারিগরি প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শূদ্ররা ছিল "দাস"। অনেক গৃহভৃত্যও ছিল দাস। যাই হোক, সাম্রাজ্য

বড় হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ল, কারিগরি শিল্প বাড়ল। অনেক কারিগর সংঘ (গীল্ড) তৈরি হল। সম্রাট অশোক আবার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ন্যায় ও করুণার নীতিতে (ধর্ম নীতিতে) রাজ্যশাসন করতে

চাইলেন। কিন্তু সমাজের মধ্যে বর্ণে-বর্ণে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব দূর করা সম্ভব হল না। মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়লো।

গ্রীক শক-কুশানদের ভারতীয় রাজ্য

মৌর্য সাম্রাজ্য যখন ভেঙ্গে পড়লো, তখন ব্যাকট্রিয়াতে ছিল কয়েকটি ছোট ছোট গ্রীক রাজ্য। এই সময়েই আবার চীনের প্রাচীর তৈরি হল। মধ্য এশিয়ার দুর্দ্ধর্ষ উপজাতি গোষ্ঠীগুলি চীনে ঢুকতে না পেরে অন্য দিকে এগলো। শকদের ধাক্কায় গ্রীকরা ঢুকলেন ভারতে। তারপর ইউ-চি-দের ধাক্কায় শকরা এলেন বোলান গিরিবর্ত্ম দিয়ে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে তাঁরা বড়সড় রাজ্য গড়লেন। তারপর এলেন কুশানরা। কুশান রাজা কণিষ্কের সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতে বেশ বড় কুশান রাজ্য গড়ে ওঠে। কুশান বংশে জন্ম হলেও বিদ্যা, ধর্ম, দেশপ্রেম এবং সুশাসনে তিনি ছিলেন একজন সার্থক ভারতীয় রাজা।

খ্রীঃ পূঃ ১৮০ সন থেকে সুরু করে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এইসব বিদেশীরা এসেছিলেন। এঁরা এখানে এসে ভারতের ভাষা ও ধর্ম গ্রহণ করে ভারতীয় হয়ে গেলেন। কিন্তু এঁরা আসায় ভারতের ধর্মে, সমাজে যে আলোড়ন হল, তাকে কাজে লাগিয়ে গুপ্ত সম্রাটরা মগধ থেকেই নূতন এক সাম্রাজ্য গড়লেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্য : গুপ্ত সম্রাটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত। উত্তর ভারতের অনেক রাজ্য জয় করে তিনি সাম্রাজ্য গড়লেন। দক্ষিণ-ভারতেও তিনি গেলেন। সমস্ত দক্ষিণ ভারত তিনি দখল করতে পারলেন না। তবে অনেকগুলি রাজ্যই তাঁর আনুগত্য মানল। সমুদ্রগুপ্ত'র ছেলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও ছিলেন বীর এবং সুশাসক। গুপ্ত সাম্রাজ্য অশোকের সাম্রাজ্যের মত বড় ছিলনা। কিন্তু বাংলাদেশ সহ সারা উত্তর ভারতকে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। হূণদেরও তাঁরা সাম্রাজ্যের বাইরে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

গুপ্তবংশের এইসব সম্রাটদের আমলেই বৈদিক ধর্মের সংস্কার করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা হিন্দু ধর্মকে রূপ দিলেন। সেই সময় থেকে এখন

পর্যন্ত হিন্দুধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান একইভাবে চলছে। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, স্থাপত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানেও এই সময় অনেক উন্নতি হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার কথা

এত কথা বলা হল! এবার নিশ্চয়ই আমাদের বাংলা দেশ সম্বন্ধে কিছু জানতে ইচ্ছে করছে।

প্রাচীন বাংলার কথা নানাভাবে ছড়িয়ে আছে কৌটিল্য, মেগাস্থেনিস, ফা-হিয়েন এবং অনেক গ্রীকদের বিবরণে। জৈন ও বৌদ্ধদের বই, পাণিনি-পতঞ্জলির লেখা, মহাভারত-রামায়ণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও অনেক খবর রয়েছে। বাংলাদেশে এবং বাংলার বাইরে অনেক খোদাই করা লিপি থেকেও অনেক কিছু জানা যায়।

উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে দ্বারভাঙ্গা, পুবে গারো লুসাই পাহাড় এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে যে জায়গা, তাই ছিল তখনকার বাংলাদেশ। তিস্তা, করতোয়া, মহানন্দা, আত্রাই, ব্রহ্মপুত্র, কোশী, গঙ্গা, ভাগীরথী ছিল বড় বড় নদী। পুণ্ড্র, গৌড়, সমতট, রাঢ়, তাম্রলিপ্তি, বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম।

আর্যরা বাংলাদেশে পৌছবার আগেও এখানকার মানুষরা ছিল কৃষি ও শিকারজীবী। নিজেদের ধর্ম ও আচারনীতি অনুসারেই তারা চলতো। আজও আমরা এদের আদিবাসী বলে থাকি। এরা অনার্য ছিল বলে আর্যরা এদের ঘৃণা করে অস্পৃশ্য মনে করেছেন। কিন্তু এখানে কৃষির ভাল জমির খোঁজ পেয়ে আর্যরা এসেছেন। এখানকার মানুষদের পরাজিত করেছেন। কর্ণ, কৃষ্ণ, ভীমের যুদ্ধ জয়ের কাহিনী থেকেই একথা বুঝা যায়।

এখানে পাকাপাকি বসবাসের ফলে এখানকার আদিম অধিবাসীদের সাথেও মেলামেশা হয়েছে। এই মেলামেশার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে বাঙ্গালী জাতি। তখন আর বাঙ্গলার মানুষকে হেয় জ্ঞান করা হয়নি। 'বর্ণ' ব্যবস্থার মধ্যে বাঙ্গালীর স্থান হয়েছে। ভারতের অন্যান্য রাজাদের সাথে সমানভাবেই বাংলাদেশের রাজারা

চলেছেন। গুপ্ত সম্রাটদের সময় বাংলাদেশ ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশ। পুণ্ড্রবর্দ্ধন (উত্তর ও মধ্য-বঙ্গ এবং বর্দ্ধমানের জন্য ছিলেন হু'জন উপরিক (প্রদেশ-পাল)। এই সময়েই এখানে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি পুরোপুরি চালু হয়।

কৃষি ও বাণিজ্যের গুণে বাংলাদেশ ছিল বেশ সচ্ছল। ভারতের অন্যান্য জায়গার সাথে নিয়মিত বাণিজ্য হত। তাম্রলিপ্তির মত বন্দর থেকেও হত সামুদ্রিক বাণিজ্য। বাণিজ্যের গুণে নানা ধরনের শিল্প ও কারিগরিও ছিল। কারিগর ও বণিকদের অবস্থা ছিল খুবই ভাল। কিন্তু আদিবাসী ও কৃষকদের জীবন তেমন সম্মানের ছিল না। সবচেয়ে হুঃখের জীবন ছিল দাসদের। দাস ব্যবস্থা এবং দাস কেনাবেচা সম্বন্ধে সেই প্রাচীন কালের লেখাতেই উল্লেখ আছে। ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণরাই হলেন শ্রেষ্ঠবর্ণ এবং সমাজপতি। ব্রাহ্মণদের পরেই ছিল বৈদ্য এবং করণ শ্রেণী। বৃত্তি অনুসারে শূদ্রদের মধ্যে ছিল কমপক্ষে ৩৬টি উপবর্ণ। দেড় হাজার বছর আগেকার এই অবস্থার চিহ্ন আজও আমাদের সমাজে রয়েছে।

বিদেশের সাথে যোগাযোগ

হরপ্পা সভ্যতার সাথে সুমের মিসরের যোগাযোগ ছিল, সে কথা তো আগেই জেনেছ। পারস্য সম্রাটরা ভারতের প্রান্ত জয় করায় যোগাযোগ হল পারস্যের সাথে। তারপর আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পরে যোগাযোগ হল গ্রীকজগতের সাথে। সবশেষে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক, শক, কুশানরা ভারতে ঢুকবার পরে মধ্য এশিয়ার দিকে ভারতের দরজা সম্পূর্ণ খুলে গেল।

এই যোগাযোগের ফলে তক্ষশীলা, কাবুল, ইরাণ, এশিয়া মাইনর, কাস্পিয়ান এবং কৃষ্ণসাগরের পাড় দিয়ে পার্সিপলিস পর্যন্ত নানা জায়গার সাথে ভারতের বাণিজ্য হয়েছে। মধ্য এশিয়ায় কাসগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান, মিরাণ, তুরফান প্রভৃতি ছিল বণিকদের ঘাঁটি। চীনের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। "রেশম রাস্তা" দিয়ে অঢেল বাণিজ্য হয়েছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও গেছেন মধ্য এশিয়া এবং চীনে।

জলপথে বাণিজ্য হয়েছে সিংহল, পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর অঞ্চল এবং আলেকজান্দ্রিয়ার সাথে। আবার পুবদিকে জাহাজ গেছে মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কম্বোডিয়া, বোর্ণিও, ব্রহ্মদেশে। বাণিজ্য বাড়বার ফলে কারিগর, বণিক, শ্রেষ্ঠীরা সম্পদশালী হয়েছেন। তাঁদের সংঘ (গীল্ড) তৈরি হয়েছে। শহরগুলির জৌলুস বেড়েছে। পারস্য ও গ্রীসের সাথে যোগাযোগের ফলে পাথর স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলার উন্নতি হয়েছে। অসংখ্য স্তূপ, চৈত্য ও গুহামন্দির তৈরি হয়েছে। চীন থেকে পরিব্রাজকরা ভারতে এসেছেন। ভারত থেকে ভিক্ষুরা চীনে গেছেন। বিদেশীদের সাথে যোগাযোগের ফলে বৌদ্ধ, জৈন এবং হিন্দু ধর্মে নানা মতের উদ্ভব হয়েছে।

বিদেশীর দেখা প্রাচীন ভারত

মেগাস্থেনিস ছিলেন মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় গ্রীক দূত। পাটলিপুত্রের তিনি খুব প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন ভারতবাসীরা ছিলেন সরল এবং সৎ। তাঁদের খাওয়া দাওয়ার আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু মসলিনের কাপড়, সোনা এবং পাথর বসানো বেশভূষার খুব আড়ম্বর ছিল। তাঁর মতে ভারতে কোন দাস ছিল না। ভারতের মানুষকে তিনি দার্শনিক, কৃষক, পশুপালক, শিল্পী, যোদ্ধা, সরকারী পরিদর্শক এবং অমাত্য—এই সাত ভাগে ভাগ করে দেখেছেন। বণিকরা ছিলেন খুবই ধনী।

মেগাস্থেনিসের ছয়শ' বছর পরে চীন থেকে এসেছিলেন ফা হিয়েন। তাঁর বিবরণেও রয়েছে ভারতের মধ্যে ও বাইরে অনেক বাণিজ্য হয়েছে। দেশের মধ্যেও শিল্প স্থাপত্যে উন্নতি হয়েছে। হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম তখন চলেছে পাশাপাশি। ভারতীয়রা ছিলেন শান্তিপ্রিয় এবং চরিত্রবান।

প্রাচীন ভারতের সাফল্য

নানা ধর্ম এবং বর্ণভেদ সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতের মানুষ অনেক দিকেই গৌরব এনেছিলেন। সীমান্ত অঞ্চলে খরোষ্ঠি এবং দেশের

মধ্যে ব্রাহ্মি ছাড়াও অনেক রকম প্রাকৃত লিপি এবং ভাষাও প্রচলিত হয়েছিল। সংস্কৃত তো ছিলই। ব্যাকরণের উন্নতি হয়েছিল পাণিনি, পতঞ্জলি এবং তাঁদের আগেকার অনেক পণ্ডিতের চেষ্টায়। সমস্ত রকম বৈদিক সাহিত্য ছাড়াও মহাভারত, রামায়ণ, পঞ্চতন্ত্র এবং অষ্টাদশ পুরাণ রচনা হয়েছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্র আলো করেছিলেন কালিদাস, অশ্বঘোষ, ভর্তৃহরি, শূদ্রক প্রভৃতি। জৈন, বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্মের কথা ছাড়াও ন্যায়, সাংখ্য, যোগ দর্শনের অনেক ধারা সৃষ্টি হয়েছিল। রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি রচনা করেন কৌটিল্য।

ব্রাহ্মিলিপি

প্রাচীন ভারতের ছেলেরা বৈদিক শিক্ষা পেতেন গুরুগৃহে এবং তপোবন আশ্রমে। তা ছাড়া বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তক্ষশীলায় পড়ানো হত বেদ এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্টনীতি, চিকিৎসা বিজ্ঞান। নালন্দায় ছিল সে যুগের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়। ৮৫০০ ছাত্র এবং ১৫০০ অধ্যাপকের জন্য এখানে ছিল ৩০০টি ছোট ঘর, ৮টি হল-ঘর এবং ৩টি বড় গ্রন্থাগার। বৌদ্ধ শাস্ত্র ছাড়াও এখানে জৈন শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ এবং অন্যান্য বিষয়ও পড়ানো হত। ভারতের সব জায়গা, এমন কি চীন থেকেও এখানে ছাত্র আসতো।

অজন্তার গুহাচিত্র

শিল্পকলা ও স্থাপত্যে সাফল্যের চিহ্ন রয়েছে অশোকস্তম্ভ, শিলা

লিপি, অসংখ্য চৈত্য, স্তূপ, বিহার, ইলোরার কৈলাস মন্দির এবং অজন্তা ইলোরার গুহামন্দিরে। অজন্তা গুহার দেয়ালে যে ছবি আঁকা রয়েছে, তা আজও আমাদের অবাক করে। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব এবং অন্যান্য মূর্তি তৈরি হয়েছে অমরাবতী, মথুরা এবং গান্ধারে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগেও ভারত অনেক এগিয়েছিল। আয়ুর্বেদ, অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন ধন্বন্তরী, জীবক, সুশ্রুত, চরক, পরাশর প্রভৃতি। শল্য চিকিৎসা (অপারেশন পদ্ধতিও) চালু ছিল। লোহাশাস্ত্র, বিষবিদ্যা, ধাতব শিল্প এবং জল বিশুদ্ধ করবার প্রণালীতে রসায়নের জ্ঞান লাগানো হয়েছিল।

গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে ভারতের সাফল্য ছিল খুবই বেশী। রাস্তায় দূরত্বের চিহ্ন, শূন্য, দশমিক ইত্যাদি ভারতে প্রচলিত হয়। সূর্যসিদ্ধান্তে রয়েছে জ্যামিতির ত্রিকোণমিতি। বীজগণিতে বিখ্যাত ছিলেন আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বছরের দৈর্ঘ হিসেব করা হয়েছে। পৃথিবী কি ভাবে ঘুরছে সেই ব্যাখ্যা এবং বার্ষিক ও আহ্নিক গতির হিসেবও দিয়েছিলেন আর্যভট্টের মত পণ্ডিতরা। মহাকাশে ভারতীয় উপগ্রহের নামও হয়েছে 'আর্যভট্ট' ও 'ভাস্কর'।

* * *

কিন্তু এতদিকে এত সাফল্য সত্ত্বেও এর পরে ভারতের আরও উন্নতি হয়নি কেন? কেনই বা ভারত বারে বারে বিদেশীদের কাছে পরাজিত হয়েছে?

অন্যান্য কারণ ছাড়াও এর দুটি প্রধান কারণ ছিল দাস ব্যবস্থা এবং বর্ণভেদ। ক্রীতদাস কেনাবেচা ভারতেও ছিল। স্বেচ্ছা-দাসত্বও ছিল। অবশ্য গ্রীস, রোম, মিসরের অবস্থা ভারতে ছিল না।

দাস জীবনের পরিবর্তন সম্ভব ছিল। কিন্তু বর্ণভেদ ছিল অপরিবর্তনীয়। বর্ণভেদ এবং অস্পৃশ্যতার ব্যাধির ফলে সমাজের পক্ষে আর এগিয়ে চলা সম্ভব হয়নি। এই ব্যাধি আজও পর্যন্ত আমাদের সমাজে বিষের মত কাজ করে চলেছে।

অনুশীলনী

মনে রাখবে :—

১। আর্যরা আসবার পরে গো-পালন থেকে স্থায়ী ভাবে কৃষি জীবন এবং তারও পরে ব্যবসা বাণিজ্য ও কারিগরি বাড়বার ফলে নগর জীবন সুরু হয়েছে।

২। সমাজে যার যেমন সম্মান প্রাপ্য তেমনটি না পেলে শান্তি এবং উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যায়। পুরানো যুগের ভারতেও যারা উৎপাদন করেছেন, তাঁদের জায়গা হয়েছে অস্পৃশ্য নীচু বর্ণে। এই অবস্থায় সমাজের উন্নতি সম্ভব হয়নি।

৩। ষোলটি মহাজনপদের মধ্যেই ছিল সাম্রাজ্যের বীজ। মগধের একটানা উন্নতি হয় বিম্বিসার থেকে অশোকের সময় পর্যন্ত। অশোকের সময়ই সাম্রাজ্য ছিল সবচেয়ে বড়।

৪। মৌর্য এবং গুপ্ত সম্রাটদের মাঝখানে যাঁরা ভারতে ঢুকেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন মিনান্দার (গ্রীক), রুদ্রদামন (শক), কনিষ্ক (কুশান)।

৫। সময়গুলি মনে রাখবে—

রাজত্বকাল-(মৌর্য) চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ পূঃ ৩২২—২৯৮
,, বিন্দুসার ,, ২৯৮—২৭৩
,, অশোক ,, ২৭৩—২৩২
(গুপ্ত) সমুদ্রগুপ্ত খ্রীঃ ৩৩০—৩৭৫
,, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৩৭৫—৪১৩

মহাবীরের মৃত্যু-খ্রীঃ পূঃ ৫২৭
বুদ্ধের মৃত্যু- ,, ৪৮৭
} কিন্তু দুটি তারিখ সম্বন্ধেই মতভেদ আছে।

করণীয় কাজ

আমাদের সমাজে বর্ণভেদ সম্বন্ধে তুমি যা ভাব সেই বিষয়ে এক পৃষ্ঠা লিখবে।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :

আর্যরা কখন ভারতে আসেন? প্রথমে তাঁরা কোথায় থাকেন? তখন তাঁদের প্রধান জীবিকা কি ছিল? আর্যদের রচনা করা প্রথম গ্রন্থ কোন খানি? অন্যান্য বেদ-এর নাম বল। জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে পরীক্ষা

মোট নম্বর— ১০০ ; সময় ৩ ঘণ্টা

১। খুব সংক্ষেপে লেখ :— ১×১০=১০

(ক) কাদের মধ্যে 'দশ রাজার যুদ্ধ' হয়েছিল ? (খ) আর্যদের রাষ্ট্র জীবন কি ধরনের ছিল ? (গ) যাগযজ্ঞের কি উদ্দেশ্য ছিল ? (ঘ) ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ক্ষোভ ছিল কেন ? (ঙ) মধ্য এশিয়া থেকে আগন্তুক ছিলেন কারা ? (চ) প্রাচীন বাংলার সীমানা কি রকম ছিল ? (ছ) বাংলা দেশে কয়টি বর্ণ এবং উপবর্ণ ছিল ? (জ) অশোক কোন্ রাজ্য জয় করেছিলেন ? (ঝ) কারা বেশী সংখ্যায় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ? (ঞ) কিভাবে ব্রাহ্মণরা কর্মফল এবং পুনর্জন্মের মধ্যে যোগাযোগ করেছিলেন ?

২। পাঁচ লাইন করে লেখ : ৬×৮=৪৮

(ক) প্রথমে কিভাবে বর্ণ বিভাগ হয়েছিল, এবং কি ভাবে বর্ণ বিভাগ স্থায়ী হয়েছে ? (খ) জৈন ধর্মের মূল কথা কী ? (গ) বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা কী ? (ঘ) বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর কি কৃতিত্ব ছিল ? (ঙ) বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী কারা এবং তাঁদের জীবনযাত্রা কি রকম ছিল ? (চ) কোন কোন বইতে বাংলাদেশ সম্বন্ধে খবর পাই ? (ছ) বাঙ্গালীদেরও আর্য বলে গ্রহণ করা হয়েছিল কেন এবং কখন ? (জ) প্রাচীন বাংলার প্রধান প্রধান অঞ্চলের নাম কী ?

৩। অর্থ বুঝিয়ে দাও—(ক) জিন, (খ) বোধি, (গ) শীল, (ঘ) মহাজনপদ। ৪×৩=১২

৪। (ক) মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পর্যন্ত প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্য গড়বার একটি বিবরণ লেখ।

(খ) বিদেশের কোন কোন জায়গার সাথে প্রাচীন ভারতের যোগাযোগ হয়েছিল ? তার ফল কি হয়েছে ?

(গ) সাহিত্য-শিক্ষা-শিল্প-বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটি ছোট নিবন্ধ লেখ। ৩×১০=৩০